৫ মানব শারীরতত্ত্ব : শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া
Human Physiology : Respiration & Breathing

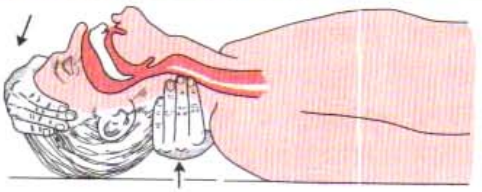

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- ☐ অ্যালভিওলাই
- ☐ প্লিউরা
- ☐ শ্বাসরন্ধ্রক
- ☐ ওটিটিস মিডিয়া
- ☐ সাইনুসাইটিস
- ☐ কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস

অক্সিজেন ছাড়া কোনো প্রাণীই বাঁচতে পারে না। আমাদের দেহেও বায়ুর সাথে অক্সিজেন শ্বসন অঙ্গে প্রবেশ করে এবং তা রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে দেহের সব অঙ্গের টিস্যুকোষে পৌছায়। এ অক্সিজেন টিস্যুকোষে সঞ্চিত খাদ্য উপাদানের সাথে বিক্রিয়া করে তাপ ও শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে জীবনকে সচল রাখে। উপজাত হিসেবে তৈরি করে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি। CO_2 রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে শ্বসন অঙ্গের মাধ্যমে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়।

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীব পরিবেশ থেকে গৃহীত অক্সিজেন দিয়ে কোষমধ্যস্থ খাদ্যবস্তুকে জারিত করে খাদ্যের স্থিতিশক্তিকে তাপ ও গতিশক্তিরূপে মুক্ত করে এবং উপজাত পদার্থ হিসেবে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন করে তাকে **শ্বসন** বলে। এ অধ্যায়ে শ্বসন প্রক্রিয়া এবং এ সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পিরিয়ড সংখ্যা-১০ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. মানুষের শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠনের সাথে কাজের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।	• শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও কাজ
২. ব্যবহারিক : ফুসফুসের অনুচ্ছেদ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে।	• **ব্যবহারিক** ○ ফুসফুসের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ
৩. মানুষের প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম (ventilation mechanism) ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে।	• প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম ও নিয়ন্ত্রণ
৪. রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন (transport) ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• গ্যাসীয় পরিবহন ○ অক্সিজেন ○ কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন
৫. শ্বসনে রঞ্জকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• শ্বাসরঞ্জক
৬. শ্বাসনালির রোগ সংক্রমণের কারণ, লক্ষণ এবং প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• মানবদেহে রক্ত সংবহনতন্ত্র
৭. একজন ধুমপায়ী ও একজন অধুমপায়ী মানুষের ফুসফুসের এক্স-রে চিত্রের তুলনা করতে পারবে।	• শ্বসননালির সমস্যা, লক্ষণ ও প্রতিকার ○ সাইনুসাইটিস ○ ওটিটিস মিডিয়া
৮. প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা হিসেবে মুখ হতে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে।	• ফুসফুসের এক্স-রে চিত্রের তুলনা ○ ধুমপায়ী মানুষের ○ অধুমপায়ী মানুষের
	• কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের উদ্দেশ্য ○ মুখ হতে মুখের সাহায্যে

মানুষের শ্বসনতন্ত্র (Human Respiratory System)

মানুষের শ্বসন অঙ্গ হচ্ছে একজোড়া **ফুসফুস** (lungs)। যে পথ দিয়ে ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ করে এবং ফুসফুস থেকে তা বহির্গত হয় তাকে **শ্বসন পথ** (respiratory passage) বলে। সম্মুখ নাসারন্ধ্র থেকে শ্বসন পথের শুরু। মানুষের শ্বসনতন্ত্রের পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন অংশকে নিচে বর্ণিত তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে বর্ণনা করা যায়।

ক. বায়ুগ্রহণ ও ত্যাগ অঞ্চল

১. সম্মুখ নাসারন্ধ্র (Anterior nostrils): নাকের সামনে অবস্থিত পাশাপাশি দুটি ছিদ্রকে সম্মুখ নাসারন্ধ্র বলে। নাক একটি হলেও **ন্যাসাল সেপ্টাম** (nasal septum) বা **নাসা ব্যবধায়ক**-এর মাধ্যমে দুটি নাসারন্ধ্রের বিকাশ ঘটেছে। সম্মুখ নাসারন্ধ্র সবসময় উন্মুক্ত থাকে এবং এ পথেই বায়ু দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

২. **ভেস্টিবিউল** (Vestibule) : নাসারন্ধ্রের পরে নাকের ভিতরের অংশের নাম ভেস্টিবিউল। এর প্রাচীরে অনেক লোম থাকে। লোমগুলো ছাঁকনির মতো গৃহীত বাতাস পরিষ্কারে সহায়তা করে।

৩. **নাসাগহ্বর** (Nasal cavity) : ভেস্টিবিউলের পরের অংশটি নাসাগহ্বর। নাসাগহ্বরের প্রাচীরে সিলিয়াযুক্ত মিউকাস ক্ষরণকারী ও অলফ্যাক্টরী কোষ থাকে। এটি আগত প্রশ্বাস বায়ুকে কিছুটা সিক্ত করে। সিলিয়াযুক্ত ও মিউকাস কোষগুলো ধুলাবালি এবং রোগজীবাণু আটকে দেয়। অলফ্যাক্টরি কোষ ঘ্রাণ উদ্দীপনা গ্রহণে সাহায্য করে।

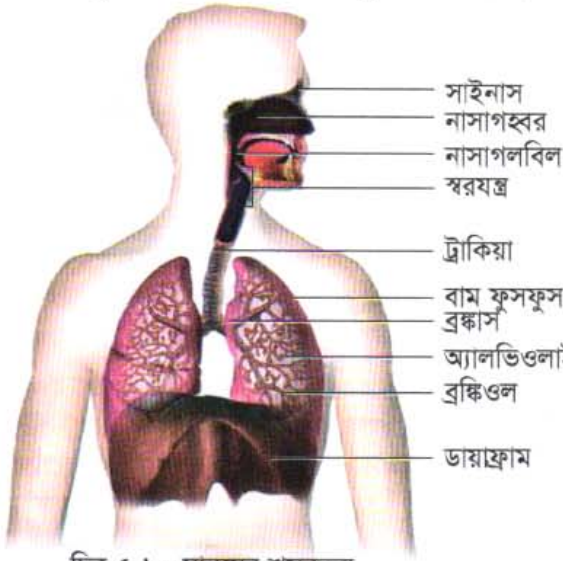

চিত্র ৫.১ : মানুষের শ্বসনতন্ত্র

৪. **পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র** (Posterior nostrils) : নাসা গহ্বরদ্বয় যে দুটি ছিদ্রের মাধ্যমে নাসাগলবিলে উন্মুক্ত হয় তাকে **কোয়ানা** (choana) বা পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র বলে। এসব ছিদ্রপথে বাতাস নাসাগলবিলে প্রবেশ করে।

৫. **নাসাগলবিল** (Nasopharyx) : পশ্চাৎ নাসারন্ধ্রের পরে নাসাগলবিল অবস্থিত। এর পরেই **মুখ-গলবিল** (oropharynx), যা স্বরযন্ত্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

৬. **স্বরযন্ত্র** (Larynx) : এটি নাসাগলবিলের নিচের অংশের ঠিক সামনের দিকের অংশ এবং কয়েকটি তরুণাস্থি টুকরায় গঠিত। এগুলোর মধ্যে থাইরয়েড তরুণাস্থি সবচেয়ে বড় এবং এটি গলার সামনে উঁচু হয়ে ওঠে (পুরুষে)। হাত দিলে এর অবস্থান বোঝা যায় এবং বাইরে থেকে দেখা যায়। একে Adam's Apple বলে। স্বরযন্ত্রের উপরে থাকে একটি ছোট **এপিগ্লটিস** (epiglottis)। স্বরযন্ত্রে অনেক পেশি যুক্ত থাকে। এর অভ্যন্তরভাগে থাকে মিউকাস আবরণী ও **স্বররজ্জু** (vocal cord)। পেশির সংকোচন–প্রসারণই স্বররজ্জুর টান (tension) বা শ্লথন (relaxation) নিয়ন্ত্রণ করে। টানটান অবস্থায় বাতাসের সাহায্যে স্বররজ্জু কম্পিত হয়ে **শব্দ** সৃষ্টি করে। এপিগ্লটিস খাদ্য গলাধঃকরণের সময় স্বরযন্ত্রের মুখটি বন্ধ করে দেয়। ফলে খাদ্য স্বরযন্ত্রে প্রবেশ করতে পারে না, অন্য সময় এটি শ্বসনের উদ্দেশে উন্মুক্ত থাকে। স্বরযন্ত্রে **স্বর** সৃষ্টি হয়।

খ. বায়ু পরিবহন অঞ্চল

৭. **শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া** (Trachea) : স্বরযন্ত্রের পর থেকে পঞ্চম বক্ষদেশীয় কশেরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ১২ সেমি. দীর্ঘ ও ২ সেমি. ব্যাসবিশিষ্ট ফাঁপা নলাকার অংশকে ট্রাকিয়া বলে। এটি ১৬–২০টি তরুণাস্থি নির্মিত অর্ধবলয়ে (C–আকৃতির) গঠিত। তন্তুময় টিস্যু দিয়ে অর্ধবলয়গুলো আটকানো থাকে। ট্রাকিয়ার অন্তঃপ্রাচীরে সিলিয়াযুক্ত মিউকাস আবরণী রয়েছে। ট্রাকিয়া চুপসে যায় না বলে সহজে এর মধ্য দিয়ে বায়ু চলাচল করতে পারে। এর অন্তঃপ্রাচীরের সিলিয়া অবাঞ্ছিত বস্তুর প্রবেশ রোধ করে।

৮. **ব্রঙ্কাস** (Bronchus) : বক্ষগহ্বরে ট্রাকিয়ার শেষ প্রান্ত দুটি (ডান ও বাম) শাখায় বিভক্ত হয়; এদের নাম **ব্রঙ্কাই** (bronchi –বহুবচন)। এগুলো ফুসফুসের **হাইলাম** (hilum) দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে। ডান ব্রঙ্কাসটি অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু প্রশস্ত এবং তিনভাগে ভাগ হয়ে ডান ফুসফুসের তিনটি খণ্ডে প্রবেশ করে। বাম ব্রঙ্কাসটি দুভাগে ভাগ হয়ে বাম ফুসফুসের দুটি খন্ডে প্রবেশ করে। ফুসফুসের অভ্যন্তরে প্রতিটি **ব্রঙ্কাস** পুনঃপুনঃ বিভক্ত হয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকায় **ব্রঙ্কিওল** (bronchiole) গঠন করে। ব্রঙ্কিওল দুধরনের– **প্রান্তীয় ব্রঙ্কিওল** ও **শ্বসন ব্রঙ্কিওল**। ব্রঙ্কাসে তরুণাস্থি থাকলেও ব্রঙ্কিওলগুলো তরুণাস্থিবিহীন।

গ. শ্বসন অঞ্চল

৯. **ফুসফুস** (Lungs) : ফুসফুস সংখ্যায় দুটি এবং হালকা গোলাপী রঙের স্পঞ্জের মতো নরম অঙ্গ। বাম ফুসফুসটি আকারে ছোট, ওজনে ৫৬৫ গ্রাম, **দুই লোব** বিশিষ্ট এবং ডান ফুসফুস আকারে বড়, ওজনে ৬২৫ গ্রাম, **তিন লোব** বিশিষ্ট। ফুসফুস **দ্বিস্তরী প্লিউরাল পর্দা** (pleural membrane) দিয়ে আবৃত থাকে। ভিতরের পর্দাকে **ভিসেরাল প্লিউরা** এবং বাইরের পর্দাকে **প্যারাইটাল প্লিউরা** বলে। দুই স্তরের মাঝে প্লিউরাল গহ্বরে **প্লিউরালরস** নামক এক ধরনের রস থাকে। ব্রঙ্কাস যে অংশে ফুসফুসে প্রবেশ করে তাকে **হাইলাম** (hilum) বলে। হাইলামের মাধ্যমে ধমনি ফুসফুসে প্রবেশ

এবং শিরা ও লসিকা নালি বেরিয়ে আসে। ব্রঙ্কাস, ধমনি, শিরা, লসিকা নালি, ঘন যোজক টিস্যুতে পরিবেষ্টিত হয়ে **পালমোনারি মূল** (pulmonary root) গঠন করে এবং এর সাহায্যেই ফুসফুস ঝুলে থাকে। ফুসফুসের প্রতিটি লোব কয়েকটি **সেগমেন্ট** (bronchopulmonary segments)-এ বিভক্ত। ডান ফুসফুসে ১০টি এবং বাম ফুসফুসে ৮টি সেগমেন্ট থাকে। প্রত্যেকটি সেগমেন্ট আবার অসংখ্য **লোবিওল** (lobule)-এ বিভক্ত। লোবিওলগুলো ফুসফুসের কার্যকরী একক। ফুসফুসে রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং পরিবেশের মধ্যে O_2 ও CO_2 এর বিনিময় ঘটে।

১০. ব্রঙ্কিয়াল বা শ্বসন বৃক্ষ (Bronchial or Respiratory tree) : ট্রাকিয়ার দ্বিবিভাজনে সৃষ্ট যে ব্রঙ্কাস ডান ও বাম ফুসফুসে প্রবেশ করে তাকে **প্রাইমারি ব্রঙ্কাস** বলে। প্রাইমারি ব্রঙ্কাস বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক লোবের জন্য একটি করে **সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস** বা **লোবার ব্রঙ্কাস** (lobar bronchus) গঠন করে (ডান ফুসফুসে ৩টি এবং বাম ফুসফুসে ২টি)। সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস থেকে টার্সিয়ারী ব্রঙ্কাস বা **সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস** সৃষ্টি হয়ে একটি করে পালমোনারি সেগমেন্টে প্রবেশ করে। সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস বার বার বিভক্ত হয়ে যে সূক্ষ্ম নালির সৃষ্টি হয় সেগুলোকে **ব্রঙ্কিওল** (bronchiole) বলে যা এক একটি লোবিওলে প্রবেশ করে। সমগ্র বায়ুনালি সিস্টেমকে দেখতে একটি উল্টানো বৃক্ষের মতো দেখায় বলে একে সাধারণভাবে **শ্বসন বৃক্ষও** বলে।

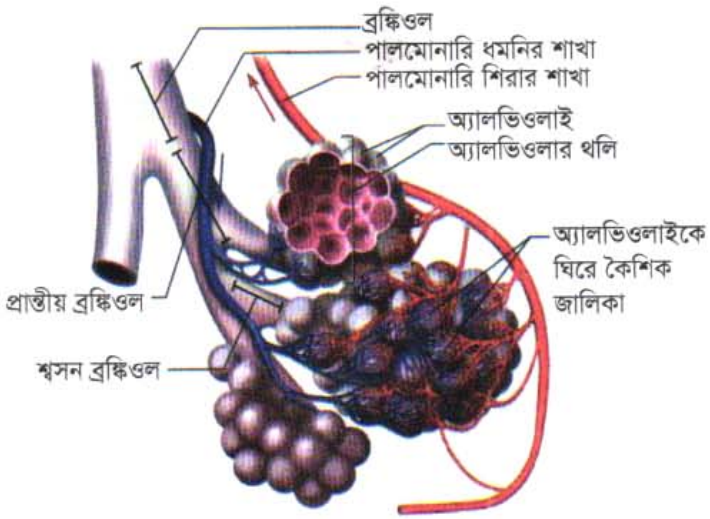

চিত্র ৫.২ : ব্রঙ্কিওলের প্রান্তীয় অংশ যাতে রক্ত সরবরাহসহ অ্যালভিওলাই দৃশ্যমান

ব্রঙ্কাস প্রাচীরে তরুণাস্থি (cartilage) থাকে, ব্রঙ্কিওলে থাকেনা। ব্রঙ্কিওল ব্রঙ্কাসের চেয়ে বেশি মসৃণ পেশি ধারণ করে, তবে ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওল উভয়ে সিলিয়াসম্পন্ন স্তম্বাকার এপিথেলিয়াম (columner epithelium)-এ আবৃত। প্রতিটি লোবিওলে ব্রঙ্কিওল বিভক্ত হয়ে প্রান্তীয় ব্রঙ্কিওল, শ্বসন ব্রঙ্কিওল, অ্যালভিওলার নালি, অ্যাট্রিয়াম, অ্যালভিওলার থলি এবং সর্বশেষে **অ্যালভিওলাস** (alveolus, pl.-alveoli) সৃষ্টি করে। অ্যালভিওলার নালি এবং অ্যালভিওলাই সরল আঁইশাকার এপিথেলিয়াম (squamous epithelium) দিয়ে আবৃত।

অ্যালভিওলাস-এর গঠন

অ্যালভিওলাস ফুসফুসের কার্যকরী একক। এগুলো আঙ্গুরের থোকার মতো গুচ্ছাবদ্ধ, অতি ক্ষুদ্রাকায়, বুদবুদ সদৃশ বায়ুথলি এবং গ্যাস বিনিময়ের তল (gas cxchange surface) গঠন করে। ফুসফুসে অ্যালভিওলাসের সংখ্যা বয়সের সাথে সম্পর্কিত। নবজাতক শিশুর ফুসফুসে মাত্র ২০ মিলিয়ন অ্যালভিওলাই থাকে, ৮ বছরে এ সংখ্যা ৩০০ মিলিয়ন; অন্যদিকে একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের দুটি ফুসফুসে থাকে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন অ্যালভিওলাই এবং এগুলো প্রায় ১১,৮০০ বর্গ সেন্টিমিটার শ্বসনতল সৃষ্টি করে। অ্যালভিওলাসের ব্যাস ২০০–৩০০ মাইক্রোমিটার এবং প্রাচীর মাত্র ০৪ মাইক্রোমিটার পুরু। এগুলোর বাইরের দিকে প্রচুর কৈশিকজালিকা নিবিড়ভাবে অবস্থান করে। **পালমোনারি ধমনি** থেকে এগুলোর উৎপত্তি হয় এবং পুনরায় মিলে **পালমোনারি শিরা** গঠন করে। প্রত্যেক অ্যালভিওলাসের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা, চাপা স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল কোষে গঠিত হওয়ায় সহজেই গ্যাসের ব্যাপন ঘটতে পারে। অ্যালভিওলাস প্রাচীর ফ্যাগোসাইটিক অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজ ধারণ করে। ম্যাক্রোফেজ অণুজীব এবং অন্যান্য বহিরাগত

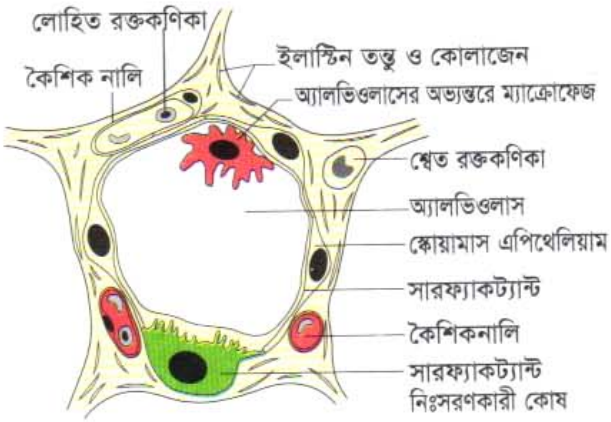

চিত্র ৫.৩ : অ্যালভিওলাসের গঠন

কণা ধ্বংস করে। তাছাড়া প্রাচীরে কোলাজেন ও স্থিতিস্থাপক তন্তু থাকে। এ স্থিতিস্থাপক সূত্রের কারণে প্রশ্বাস-নিঃশ্বাসের সময় অ্যালভিওলাস সহজেই প্রসারিত হতে পারে,আবার পূর্বাবস্থায় ফিরেও আসতে পারে।

অ্যালভিওলাস প্রাচীরে **সেপ্টাল কোষ** নামক কিছু বিশেষ কোষ থাকে যা প্রাচীরের ভিতরের দিকে **সারফ্যাকট্যান্ট** (surfactant; dipalmitoyl lecithin) নামক **ডিটারজেন্ট** (detergent)-এর অনুরূপ ফসফোলিপিড রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। সারফ্যাকট্যান্ট সারফেস টেনসন হ্রাস করে অ্যালভিওলাসকে চুপসে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। সারফ্যাকট্যান্টবিহীন অ্যালভিওলাস তথা ফুসফুস যথাযথ কাজ করতে পারে না। ২৩ সপ্তাহ বয়স্ক মানবভ্রূণে সর্বপ্রথম সারফ্যাকট্যান্ট ক্ষরণ শুরু হয়। এ কারণে ২৪ সপ্তাহের আগে মানবভ্রূণকে স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী গণ্য করা হয় না। অনেক দেশে তাই এ সময়কাল পর্যন্ত গর্ভপাতের অনুমতি দেয়া হয়।

শ্বসনতন্ত্রের কাজ

১. **শ্বসন গ্যাসের বিনিময় :** শ্বসনের সময় পরিবেশের O_2 রক্তে মিশে এবং রক্ত থেকে CO_2 পরিবেশে পরিত্যক্ত হয়।

২. **শক্তি উৎপাদন :** শ্বসনতন্ত্রের মাধ্যমে গৃহিত O_2 কোষীয় শ্বসনে ব্যবহৃত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে।

৩. **পানি সাম্য :** নিঃশ্বাসের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ৪০০–৬০০ মিলিলিটার পানি দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এতে দেহের পানি সাম্য বজায় রাখতে সুবিধা হয়।

৪. **তাপ নিয়ন্ত্রণ :** নিঃশ্বাসের সময় CO_2 এর সাথে দেহের কিছু তাপ নির্গত হয়ে দেহের তাপমাত্রা বজায় থাকে।

৫. **এসিড ও ক্ষারের সাম্যতা :** নিঃশ্বাস বায়ুর মাধ্যমে CO_2 দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হওয়ায় pH নিয়ন্ত্রণে সহায়তা হয়।

৬. **শব্দ উৎপন্ন :** ল্যারিংক্সের মাধ্যমে শব্দ উৎপন্ন হয়।

৭. **হোমিওস্টিসিস :** দেহাভ্যন্তরের স্থিতাবস্থা বা হোমিওস্টেটিস (homeostasis; কোন জীব কর্তৃক অবিরত তার অন্তঃস্থ পডরবেশ রক্ষা করা বা জীবন ক্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। এর ফলে পরিবর্তিত পরিবেশেও জীবকোষগুলো দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে।

৮. **উদ্বায়ী গ্যাস :** দেহ থেকে কিছু উদ্বায়ী গ্যাস, যেমন-ক্লোরোফর্ম, ইথার, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি নিষ্কাশন করে।

৯. **দূষিত পদার্থের প্রবেশ রোধ :** শ্বসনতন্ত্র বাতাসে বিদ্যমান জীবাণু ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ প্রবেশ রোধ করে।

ব্যবহারিক

ফুসফুসের অনুচ্ছেদ (Section through Lung)

শনাক্তকরণ

১. অনুচ্ছেদের অভ্যন্তরভাগে বুদবুদ-এর মতো অসংখ্য **অ্যালভিওলাই** (alveoli) থাকে।

২. অ্যালভিওলাইগুলো **ট্র্যাবেকুলি** (trabeculae) নামক ব্যবধায়ক পর্দার মাধ্যমে পৃথক।

৩. অসংখ্য সূক্ষ্ম সিলিয়াযুক্ত বায়ু নালিকা বা **ব্রঙ্কিওল** (bronchiole) দেখা যায়।

৪. অ্যালভিওলাই ও ব্রঙ্কিওলের ফাঁকে ফাঁকে **রক্তনালি** অবস্থিত।

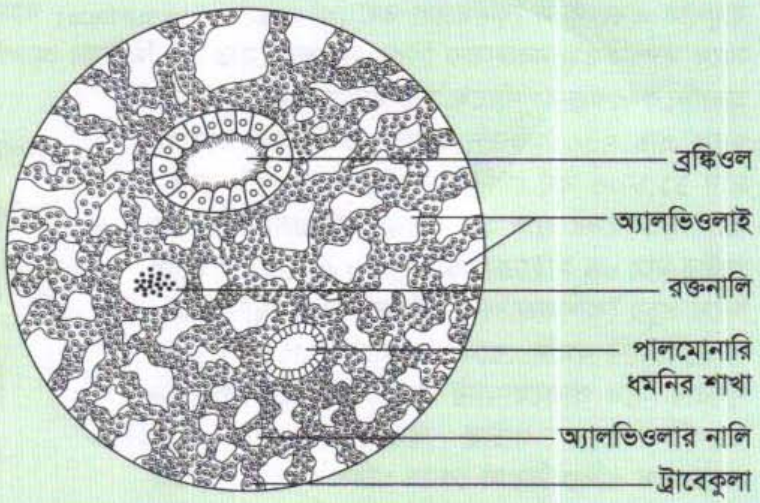

চিত্র ৫.৪ : ফুসফুসের অনুচ্ছেদ (অংশ বিশেষ)

শ্বসনের শারীরবৃত্ত (Physiology of Respiration)

পরিবেশ থেকে গৃহীত O_2 দিয়ে কোষমধ্যস্থ খাদ্য (গ্লুকোজ) জারিত করে শক্তি উৎপাদন শেষে CO_2 পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়ার জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নাম **শ্বসন**। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া ও মানবদেহে নিরন্তর চলমান প্রক্রিয়া। নিচে বর্ণিত দুটি পর্যায়ের মাধ্যমে সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়।

১. বহিঃশ্বসন (External respiration) : এটি ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া যা ফুসফুসে সংঘটিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় এনজাইমের কোন ভূমিকা নেই এবং কোন শক্তিও উৎপন্ন হয় না। ফুসফুসের অ্যালভিওলাইয়ে প্রশ্বাসের মাধ্যমে গৃহীত O_2 এবং দেহকোষ থেকে উৎপন্ন এবং রক্তবাহিত CO_2 গ্যাসের বিনিময় ঘটে।

২. অন্তঃশ্বসন (Internal respiration) : এটি জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়া যা দেহকোষ ও রক্তে সংঘটিত হয়। এখানে এনজাইমের ভূমিকা ব্যাপক এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। ফুসফুস কর্তৃক বায়ুমণ্ডল থেকে গৃহীত O_2 রক্ত দ্বারা বাহিত হয়ে দেহকোষে পৌঁছায় যেখানে গ্লুকোজ জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে। উপজাত বস্তু হিসেবে নির্গত CO_2 রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়ে ফুসফুসে পৌঁছায়।

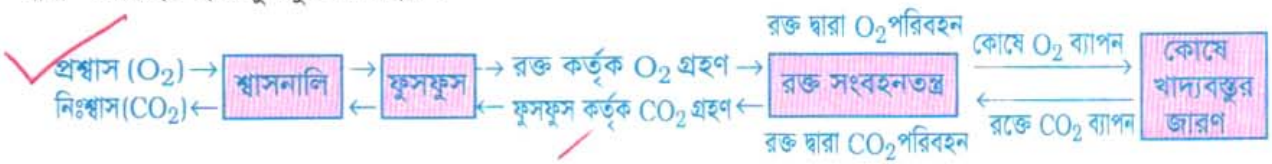

নিচে প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম এবং গ্যাসীয় পরিবহন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হলো।

প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম (Ventilation Mechanism)

যে প্রক্রিয়ায় ফুসফুসে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড-সমৃদ্ধ বায়ু ফুসফুস থেকে বের হয়ে যায় তাকে **শ্বাসক্রিয়া** (breathing) বলে। প্রকৃতপক্ষে এটি বহিঃশ্বসন প্রক্রিয়া। বক্ষগহ্বরের আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে ফুসফুসের আয়তন সঙ্কোচন-প্রসারণের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দুধরনের পেশির ক্রিয়ায় বক্ষগহ্বরের আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে : (১) বক্ষ ও উদর গহ্বরের মাঝে অবস্থিত **মধ্যচ্ছদা** বা **ডায়াফ্রাম** (diaphragm) এবং (২) পর্শুকাসমূহের (ribs) ফাঁকে অবস্থিত **ইন্টারকোস্টাল পেশি** (intercostal muscle)। শ্বাসক্রিয়া দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়, যথা: (ক) **প্রশ্বাস** বা শ্বাসগ্রহণ এবং (খ) **নিঃশ্বাস** বা শ্বাসত্যাগ।

ক. প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ (Inspiration) : ডায়াফ্রাম-পেশি সংকুচিত হলে এর কেন্দ্রীয় **টেনডন** (tendon) নিম্নমুখে সঞ্চালিত হয়। ফলে বক্ষগহ্বরের অনুদৈর্ঘ্য ব্যাস বেড়ে যায়। একই সময় নিম্নভাগের **পর্শুকাগুলো** (ribs) কিছুটা উপরে উঠে আসায় বক্ষগহ্বরের পার্শ্বীয় এবং অগ্র-পশ্চাৎ ব্যাসও বেড়ে যায়। **ইন্টারকোস্টাল** (intercostal) পেশির সংকোচনের ফলে পর্শুকার দেহ (shaft) উত্তোলিত হয়। এতে স্টার্নাম উপরে উঠে সামনে সঞ্চালিত হয়। ফলে বক্ষের অগ্র-পশ্চাৎ ব্যাসসহ অনুপ্রস্থ ব্যাস বৃদ্ধি পায়।

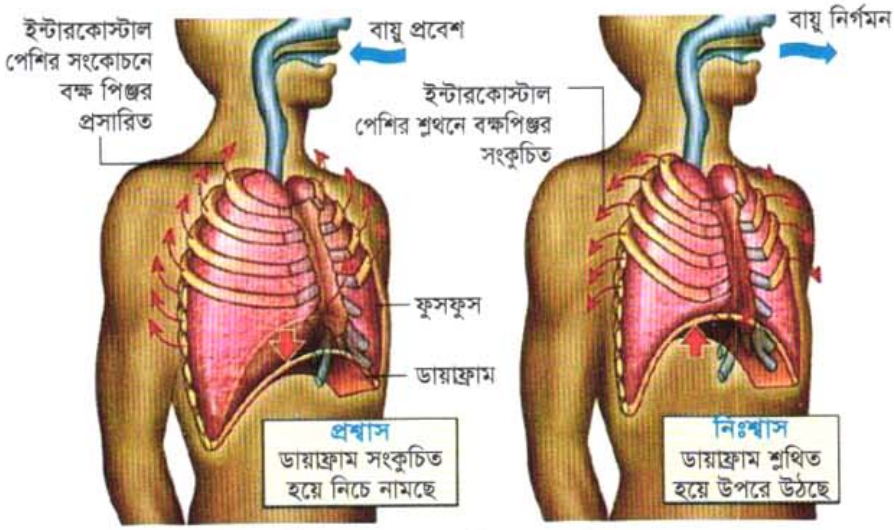

চিত্র ৫.৫ : প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম

এভাবে ডায়াফ্রাম ও পর্শুকা পেশির সংকোচনের ফলে বক্ষীয় গহ্বর সবদিকে বেড়ে যায়। এ কারণে ফুসফুস প্রসারিত হয়ে এর ভিতরের আয়তনও বাড়িয়ে দেয়। প্রসারিত ফুসফুসের অভ্যন্তরীণ চাপ বাতাসের সাধারণ চাপ অপেক্ষা কম হওয়ায় নাসিকা পথের ভিতর দিয়ে আসা বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে।

পরিবেশ থেকে O_2-সমৃদ্ধ বায়ু নাসারন্ধ্র পথে ট্রাকিয়া→ব্রঙ্কাস→ব্রঙ্কিওল→অ্যালভিওলাই তথা ফুসফুসে প্রবেশ।

খ. নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ (Expiration) : এটি প্রশ্বাসের পর পরই সংঘটিত একটি নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া। প্রশ্বাসে অংশগ্রহণকারী পেশিগুলোর প্রসারণ বা শিথিলতার জন্য নিঃশ্বাস ঘটে।

নিঃশ্বাসের সময় প্রশ্বাসকালে অংশগ্রহণকারী পেশিগুলো স্থিতিস্থাপকতার জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। তখন পর্শুকাগুলো নিজস্ব ওজনের জন্য নিম্নগামী হয়; উদরীয় পেশিগুলোর চাপে ডায়াফ্রাম ধনুকের মতো বেঁকে বক্ষগহ্বরের আয়তন কমিয়ে দেয়; ফুসফুসীয় পেশি পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়; এবং প্লিউরার অন্তঃস্থ চাপ ও ফুসফুসের বায়ুর চাপ বেড়ে যায়। বাতাস তখন ফুসফুস থেকে নাসিকা পথে বেরিয়ে গেলে ফুসফুসের আয়তনও কমে যায়।

ফুসফুসে CO_2-সমৃদ্ধ বায়ু→অ্যালভিওলাই→ব্রঙ্কিওল→ব্রঙ্কাস→নাসাপথ→নাসারন্ধ্র পথে বাইরে নিষ্কাশন।

শ্বসন একটি ছন্দময় প্রক্রিয়া। পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষে বিশ্রামকালে এ প্রক্রিয়া প্রতিমিনিটে ১৪–১৮ বার এবং নবজাত শিশুতে ৪০ বার সংঘটিত হয়। তবে ব্যায়াম বা অন্য কারণে শ্বসনের হার দ্রুত হয় বলে উদরীয় পেশিও তখন শ্বসন কাজে যোগ দেয়।

প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ (Regulation of Respiration)

স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস নিয়ে আমরা তেমন ভাবি না। পশ্চাৎ মস্তিষ্কের মেডুলায় শ্বসনের এ কেন্দ্র অবস্থিত। কেন্দ্রের নিচের অংশটি (অংকীয়) **প্রশ্বাস কেন্দ্র**। এটি প্রশ্বাসের হার ও গভীরতা বাড়ায়। এ কেন্দ্রের পৃষ্ঠীয় ও পার্শ্বদেশ প্রশ্বাস বন্ধ করে নিঃশ্বাস ত্বরান্বিত করে। এ অংশগুলো **নিঃশ্বাস কেন্দ্র**। প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস কেন্দ্র ইন্টারকোস্টাল স্নায়ুর সাহায্যে ইন্টারকোস্টাল পেশির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। ব্রঙ্কিওল ও ব্রঙ্কাই মস্তিষ্কের সঙ্গে ভ্যাগাস স্নায়ুর মাধ্যমে যুক্ত। ডায়াফ্রাম ও ইন্টারকোস্টাল পেশিতে প্রেরিত ছন্দময় স্নায়ু-উদ্দীপনার ফলে এসব অংশে শ্বসনিক আন্দোলন সংঘটিত হয়।

প্রশ্বাসের কারণে ফুসফুস ফুলে উঠে, ব্রঙ্কিওলে অবস্থিত রিসেপ্টরগুলো সটান হয়, ফলে তা উদ্দীপ্ত হয়ে ভ্যাগাস স্নায়ুর মাধ্যমে আরও বেশি স্নায়ু উদ্দীপনা নিঃশ্বাস কেন্দ্রে প্রেরণ করে। তখন প্রশ্বাস কেন্দ্র ও প্রশ্বাস সাময়িক বন্ধ থাকে। বহিঃস্থ ইন্টারকোস্টাল পেশি তখন শিথিল হয়, ফুসফুসের টিস্যু চুপসে যায়, ফলে নিঃশ্বাস ঘটে। এরপর ব্রঙ্কিওলগুলো

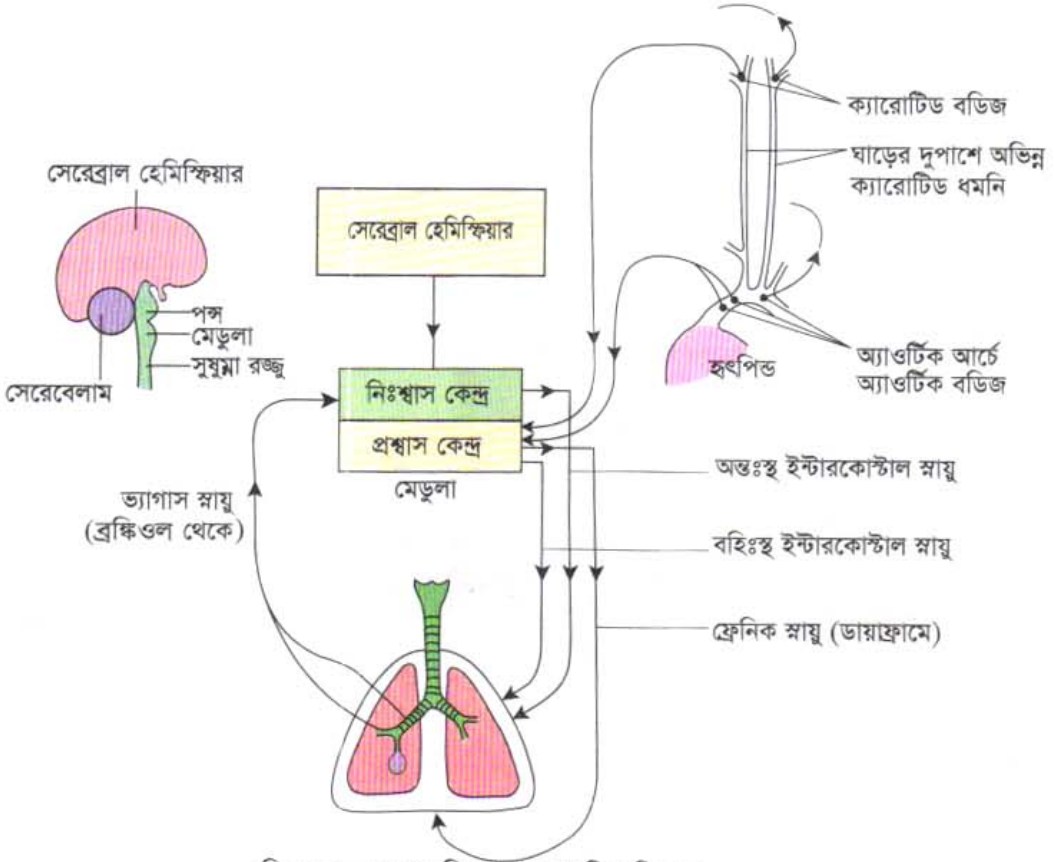

চিত্র ৫.৬ : প্রশ্বাস-নিঃশ্বাসের স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ

সটান থাকে না, রিসেপ্টরগুলো উদ্দীপ্ত থাকে না। প্রশ্বাস কেন্দ্র তখন সক্রিয় হয়ে যায় এবং আবার প্রশ্বাস শুরু হয়। এভাবে সম্পূর্ণ চক্রটি আজীবন ছন্দায়িত পুনরাবৃত্ত হয়।

শ্বসনের মৌলিক ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে **মেডুলা**। এখানে সরবরাহকৃত সমস্ত স্নায়ু কেটে ফেললেও ছন্দ অব্যাহত থাকে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় বিভিন্ন উদ্দীপনা এ মৌলিক ছন্দের হেরফের ঘটাতে পারে। প্রধান যে উদ্দীপনা প্রশ্বাস-নিঃশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে তা হচ্ছে রক্তে O_2 এর চেয়ে CO_2 এর ঘনত্ব। CO_2-এর লেভেল বেড়ে গেলে (যেমন–ব্যায়ামের সময়) রক্ত সংবহনতন্ত্রের **ক্যারোটিড ও অ্যাওর্টিক বডিজ** (carotid and aortic bodies)-এ অবস্থিত **কেমোরিসেপ্টর** উদ্দীপ্ত হয়ে প্রশ্বাস কেন্দ্রে স্নায়ু-উদ্দীপনা প্রেরণ করে। প্রশ্বাস কেন্দ্র তখন ইন্টারকোস্টাল ও ফ্রেনিক স্নায়ুর মাধ্যমে বহিঃইন্টারকোস্টাল পেশি ও ডায়াফ্রামে স্নায়ু-উদ্দীপনা প্রেরণ করে এদের সংকোচনের গতি বাড়িয়ে দেয়। এতে প্রশ্বাসের হার বেড়ে যায়। সুযোগ পেলে CO_2 দেহে দ্রুত ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। দেহে দ্রবীভূত হয়ে যে এসিড উৎপন্ন করে তা এনজাইম ও বিভিন্ন প্রোটিন বিনাশ শুরু করে। বাতাসে CO_2 ঘনত্ব ০.২৫% বাড়লে শ্বসনের হার দ্বিগুণ হয়ে যায়।

অন্যদিকে, বাতাসে যদি O_2 ঘনত্ব ২০% থেকে ৫% এ নেমে আসে তাহলেও শ্বসনের হার দ্বিগুণ হয়ে যায়। O_2-এর ঘনত্বও শ্বসন হারে প্রভাব ফেলে। তবে স্বাভাবিক পরিবেশে প্রচুর O_2 থাকে বলে প্রভাবও পড়ে কম। O_2 ঘনত্বের প্রতি সংবেদী কেমোরিসেপ্টরগুলো মেডুলা এবং অ্যাওর্টিক ও ক্যারোটিড বডিজে অবস্থান করে (এসব বডি CO_2 রিসেপ্টর হিসেবেও কাজ করে)।

সীমিত মাত্রায় শ্বসনের (প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস) হার ও গভীরতাকে ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। যেমন- **বাতাস বুকের** ভিতর টেনে নিয়ে ধরে রাখা যায়। ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণ সজোর শ্বসন, বক্তৃতা করা, গান গাওয়া, হাঁচি ও কাশি দেওয়ার জন্যেও হতে পারে। নিয়ন্ত্রণ একবার প্রয়োগ হয়ে গেলে মস্তিষ্কের সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারে যে স্নায়ু উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় তা শ্বসন কেন্দ্রে পৌঁছে নির্দেশ কার্যকর করে।

সটান (stretch) রিসেপ্টর ও কেমোরিসেপ্টরের মাধ্যমে প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ একটি নেতিবাচক প্রতিফল (negative feedback)। কিন্তু নেতিবাচক প্রতিফল সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় বাতিল হয়ে যেতে পারে।

গ্যাসীয় (O_2 ও CO_2) পরিবহন (Transport of Gases)

ফুসফুস গহ্বরের ভিতরে অ্যালভিওলাই-এর বাতাস এবং এগুলোর প্রাচীরে অবস্থিত কৈশিকনালির রক্তের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময় ঘটে।

ক. অক্সিজেন পরিবহন

প্রশ্বাসের মাধ্যমে আগত বাতাস ফুসফুসে পৌঁছালে ফুসফুসের অ্যালভিওলাইয়ে O_2-এর চাপ থাকে ১০৭ mmHg। অন্যদিকে, ফুসফুসের কৈশিকজালিকায় দেহ থেকে আগত রক্তে O_2-চাপ থাকে ৪০ mmHg। সুতরাং ফুসফুস থেকে O_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুসীয় ঝিল্লি ভেদ করে রক্তে প্রবেশ করে। এই ব্যাপন যতক্ষণ না রক্তে O_2-এর চাপ 100 mmHg উপনীত হয় ততক্ষণ অব্যাহত থাকে। রক্তে অক্সিজেন দুভাবে পরিবাহিত হয়: যথা- **ভৌত দ্রবণরূপে ও রাসায়নিক যৌগরূপে**।

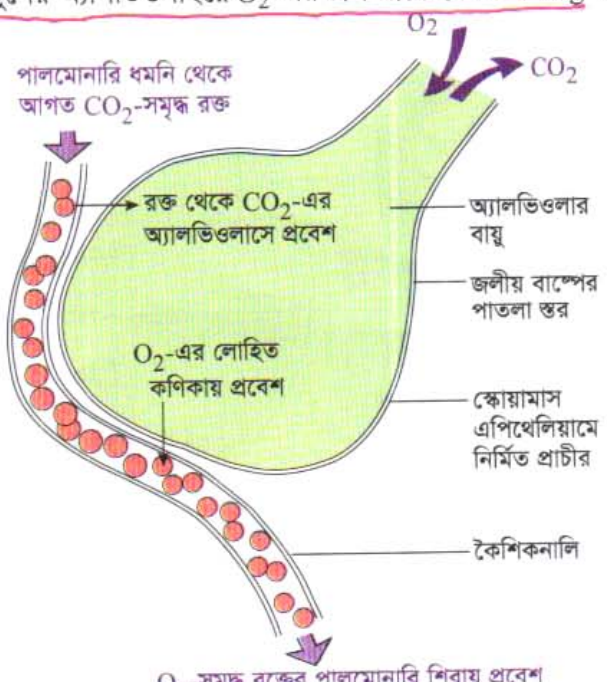

চিত্র ৫.৭ : অ্যালভিওলাসের মাধ্যমে গ্যাসীয় বিনিময়

i. ভৌত দ্রবণরূপে : প্রতি ১০০ মি.লি. রক্তে ০.২ মি.লি. অক্সিজেন ভৌত দ্রবণরূপে পরিবাহিত হয়। দ্রবীভূত অংশই রক্তে ১০০ mmHg চাপ সৃষ্টির জন্য দায়ী। তবে অংশের পরিমাণ খুব সামান্য বলে তা টিস্যুকোষে অক্সিজেন সরবরাহ কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করে না। তবে অক্সিজেন ও হিমোগ্লোবিনের সংযোজন কাজে এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

ii. রাসায়নিক যৌগরূপে : O_2 রক্তে প্রবেশের পর লোহিত কণিকায় অবস্থিত **হিমোগ্লোবিনের** সাথে যুক্ত হয়ে **অক্সি-হিমোগ্লোবিন** গঠন করে। এটি একধরনের

শিথিল রাসায়নিক যৌগ, যা অক্সিজেনের চাপ কমে গেলে পুনরায় বিযুক্ত হয়। এ সংযোজন রক্তে অক্সিজেনের দ্রবীভূত অংশের চাপের উপর নির্ভরশীল। এ চাপ যত বাড়ে হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সাথে তত বেশি সংযুক্ত হয়।

$Hb_4 + 4O_2 \rightleftharpoons 4HbO_2$ [Hb = হিমোগ্লোবিন]

খ. কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন

শর্করা জারণের সময় কোষে CO_2 সৃষ্টি হয়। এই CO_2 দেহের জন্য ক্ষতিকর। কোষ থেকে CO_2 রক্তে পরিবাহিত হয়ে ফুসফুসে পৌঁছায় এবং ফুসফুস থেকে বায়ুতে মুক্ত হয়। নিচে বর্ণিত তিনটি ভিন্ন পদ্ধতিতে CO_2 রক্তে পরিবাহিত হয়।

i. **ভৌত দ্রবণরূপে :** কিছু পরিমাণ (৫%) CO_2 রক্তরসের পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড গঠন করে।

$H_2O + CO_2 \rightarrow H_2CO_3$ (কার্বনিক এসিড)

এ বিক্রিয়ায় **কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ** এনজাইম প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

প্রতি হাজার CO_2 অণুর মধ্যে মাত্র এক অণু H_2CO_3 রূপে দ্রবণে উপস্থিত থাকে। সুতরাং CO_2-এর খুব সামান্য অংশই H_2CO_3 রূপে পরিবাহিত হয়।

ii. **কার্বামিনো যৌগরূপে :** টিস্যুকোষ থেকে রক্তের প্লাজমায় আগত CO_2 -এর কিছু অংশ লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। লোহিত কণিকার মধ্যে যে হিমোগ্লোবিন থাকে তার **গ্লোবিন** (প্রোটিন) অংশের অ্যামিনো গ্রুপের-(NH_2) সাথে CO_2 যুক্ত হয়ে **কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন** যৌগ গঠন করে।

$$CO_2 + HbNH_2 \rightarrow HbN\begin{matrix} H \\ COOH \end{matrix} = HbNHCOOH \text{ (কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন)}$$

CO_2-এর একাংশ প্লাজমা প্রোটিনের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে কার্বামিনোপ্রোটিন গঠন করে।

$PrNH_2 + CO_2 \rightarrow PrNHCOOH$ (কার্বামিনোপ্রোটিন)

এ রাসায়নিক ক্রিয়া এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়।

মোট CO_2-এর শতকরা ২৭ ভাগ কার্বামিনো যৌগরূপে পরিবাহিত হয়। প্রতি ১০০ মি.লি. রক্তে এর পরিমাণ ৩ মি.লি. যার ২ মি.লি কার্বামিনো-হিমোগ্লোবিনরূপে এবং ১ মি.লি কার্বামিনো-প্রোটিনরূপে পরিবাহিত হয়।

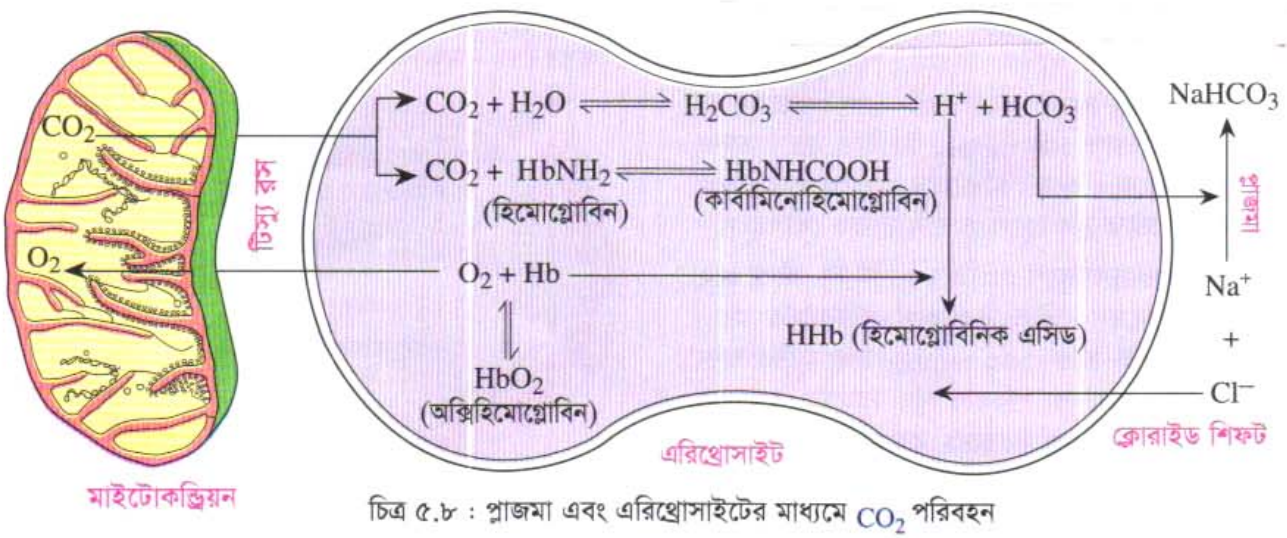

চিত্র ৫.৮ : প্লাজমা এবং এরিথ্রোসাইটের মাধ্যমে CO_2 পরিবহন

iii. **বাইকার্বোনেট যৌগরূপে :** CO_2-এর বেশির ভাগই (৬৫%) রক্তে বাইকার্বোনেটরূপে পরিবাহিত হয়। এটি–(১) $NaHCO_3$– রূপে প্লাজমার মাধ্যমে এবং (২) $KHCO_3$ –রূপে লোহিত কণিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

টিস্যুরস থেকে CO_2 প্রথমে প্লাজমায় ও পরে লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে লোহিত কণিকার মধ্যে CO_2 পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড (H_2CO_3) উৎপন্ন করে। রক্তরসে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ অনুপস্থিত থাকায় রক্তরসে খুব কম মাত্রায় কার্বনিক এসিড উৎপন্ন হয়।

$$CO_2 + H_2O \xrightarrow{\text{কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ}} \underset{\text{কার্বনিক এসিড}}{H_2CO_3} \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

লোহিত কণিকায় উৎপন্ন H_2CO_3 বিশ্লিষ্ট হয়ে H^+ ও HCO_3^- আয়নে পরিণত হয়। লোহিত কণিকায় বেশি মাত্রায় HCO_3- সঞ্চিত হওয়ায় এর ঘনত্ব প্লাজমার তুলনায় বেশি হয়।

আয়ন লোহিত কণিকা থেকে প্লাজমায় পরিব্যাপ্ত (diffuse) হয় এবং প্লাজমার Na^+ আয়নের সাথে মিলে $NaHCO_3$ উৎপন্ন করে। লোহিত কণিকার মধ্যে K^+ আয়নের সাথে HCO_3- বিক্রিয়া করে $KHCO_3$ এ পরিণত হয়।

লোহিত কণিকা থেকে প্লাজমায় HCO_3^- আয়ন আগমনের সাথে সমতা রেখে প্লাজমা থেকে Cl^- লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে এবং লোহিত কণিকায় K^+ আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে KCl গঠন করে। লোহিত কণিকা থেকে HCO_3 আয়ন বেরিয়ে আসায় ঋণাত্মক আয়নের যে ঘাটতি হয় প্লাজমার ক্লোরাইড (Cl^-) আয়ন লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে সে ঘাটতি পূরণ করে। একে **ক্লোরাইড শিফট** (chloride shift) বলে। এর প্রথম বর্ণনাকারী জার্মান শারীরবৃত্তবিদ **হার্টগ জ্যাকব হ্যামবার্গার** (Hartog Jacob Hamburger)-এর নাম অনুসারে ক্লোরাইড শিফটকে **হ্যামবার্গার শিফট**ও বলা হয়।

বহিঃশ্বসন ও অন্তঃশ্বসনের পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	বহিঃশ্বসন	অন্তঃশ্বসন
১. প্রকৃতি	একটি ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া।	একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া।
২. ক্রিয়াস্থল	ফুসফুসে সংঘটিত হয়।	কোষ ও রক্তে সংঘটিত হয়।
৩. এনজাইমের ভূমিকা	এনজাইমের কোনো ভূমিকা নেই।	এতে এনজাইমের ভূমিকা ব্যাপক।
৪. প্রধান উপ-পর্যায়	শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ।	গ্লাইকোলাইসিস, ক্রেবস চক্র ও গ্যাস পরিবহন।
৫. শক্তি	কোনো শক্তি উৎপন্ন হয় না।	নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়।

শ্বসনে শ্বাসরঞ্জকের ভূমিকা (Role of Respiratory Pigments during Respiration)

হিমোগ্লোবিন হচ্ছে মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তের লোহিত কণিকায় এবং অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর প্লাজমায় বিস্তৃত লাল বর্ণের প্রোটিনধর্মী অক্সিজেনবাহী শ্বাসরঞ্জক। লোহিত রক্তকণিকার প্রধান প্রোটিন হচ্ছে **হিমোগ্লোবিন**। এর বর্ণের জন্যই লোহিত কণিকা লাল দেখায় এবং লোহিত কণিকার সংখ্যাধিক্যের কারণে রক্ত লাল দেখায়। হিমোগ্লোবিন শ্বসন গ্যাস **অক্সিজেন** পরিবহনে প্রধান ভূমিকা পালন করে, কিছু পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইডও বহন করে। চারটি একক নিয়ে গঠিত হিমোগ্লোবিন একটি গোল অণু। এর প্রতিটি একক পলিপেপটাইড জাতীয় প্রোটিন **গ্লোবিন** (globin) এবং লৌহগঠিত **হিম** (heme) নিয়ে গঠিত। রক্তে হিম ও গ্লোবিন ১ঃ২৫ অনুপাতে উপস্থিত থাকে। হিমের ৩৩.৩৩% লৌহ (Fe)। পূর্ণবয়স্ক মানুষের সমগ্র রক্তে মাত্র ৪-৫ গ্রাম লৌহ থাকে।

i. **অক্সিজেন পরিবহন :** শ্বসনের সময় অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুস থেকে রক্তে প্রবেশ করে। রক্তে প্রবিষ্ট সমস্ত অক্সিজেনই মুক্ত অবস্থায় থাকে না। এর এক বড় অংশ লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে **অক্সিহিমোগ্লোবিন** (oxyhaemoglobin) নামে অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। এ যৌগ গঠন রক্তরসে (প্লাজমায়) অক্সিজেনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। রক্তরসে যত বেশি অক্সিজেন দ্রবীভূত হবে তার সাথে সংগতি রেখে অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ উৎপন্ন হবে। অন্যদিকে, অক্সিজেনের পরিমাণ যে হারে কমে যাবে যৌগ সে হারে ভেঙে যাবে এবং অক্সিজেন মুক্ত হয়ে রক্তরসে প্রবেশ করবে। প্রতিটি হিমোগ্লোবিন চারটি হিম অংশ থাকায় এর চারটি ফেরাস অণু চার অণু অক্সিজেন যুক্ত করতে পারে।

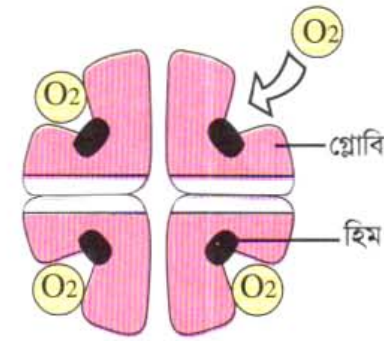

চিত্র ৫.৯ : হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেন সংবন্ধন

ii. **কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন :** CO_2 হিমোগ্লোবিনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন নামক অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন-সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃৎপিন্ড হয়ে পরিশোধনের জন্য ফুসফুসে গমন করে।

দেহে রক্ত পরিবহনের সময় বেশ কিছু পরিমাণ অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তরস থেকে স্বল্প অক্সিজেনযুক্ত টিস্যুরসে চলে যায়। ফলে রক্তরসে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়। হিমোগ্লোবিন তখন তার সাথে যুক্ত অক্সিজেন ছড়াতে শুরু করে। এভাবে অক্সিজেন প্রথমে রক্তরসে ও পরে টিস্যুরসে চলে যায়।

শ্বসননালির সমস্যা, লক্ষণ ও প্রতিকার
(Problems, Symptoms and Remedy of Respiratory Tract Disease)

সচল মানবদেহের জন্য সুস্থ অঙ্গতন্ত্র প্রয়োজন। বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের মধ্যে শ্বসনতন্ত্রের **শ্বসননালি** অন্যতম প্রধান অঙ্গ। কিন্তু এটি প্রায়ই ভাইরাসে, মাঝে-মধ্যে ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সচল দেহকে প্রায় আধা-অচল করে দেয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা শ্বসননালির সংক্রমণকে দুভাগে ভাগ করে থাকেন। (১) **উর্ধ্ব শ্বসননালিতে সংক্রমণ** (ফলে নাক, কান, গলা, সাইনাস আক্রান্ত হয়) এবং (২) **নিম্ন শ্বসননালিতে সংক্রমণ** (ফলে শ্বাসনালি ও ফুসফুস আক্রান্ত হয়)। উর্ধ্ব শ্বসননালিতে সংক্রমণের উদাহরণ হিসেবে সিলেবাসভুক্ত **সাইনুসাইটিস** ও **ওটাইটিস মিডিয়া** সৃষ্ট সমস্যা, লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

সাইনুসাইটিস (Sinusitis)

মাথার খুলিতে মুখমন্ডলীয় অংশে নাসাগহ্বরের দুপাশে অবস্থিত বায়ুপূর্ণ চারজোড়া বিশেষ গহ্বরকে **সাইনাস** বা **প্যারান্যাসাল সাইনাস** (paranasal sinus) বলে। এগুলো হলো–

১. **ম্যাক্সিলারি সাইনাস** (Maxillary sinus) : ম্যাক্সিলারি অঞ্চলে গালে অবস্থিত।
২. **ফ্রন্টাল সাইনাস** (Frontal sinus) : চোখের উপরে অবস্থিত।
৩. **এথময়েড সাইনাস** (Ethmoid sinus) : দু'চোখের মাঝখানে অবস্থিত।
৪. **স্ফেনয়েড সাইনাস** (Sphenoid sinus) : এথময়েড সাইনাসের পেছনে অবস্থিত।

সাইনাস সাধারণত বায়ুপূর্ণ মিউকাস পর্দায় আবৃত এবং ক্ষুদ্র নালির মাধ্যমে নাসাগহ্বর তথা শ্বাসনালির সাথে যুক্ত থাকে। এসব সাইনাস যদি বাতাসের বদলে তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে এবং এই তরল যদি ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকে সংক্রমিত হয় তখন সাইনাসের মিউকাস পর্দায় প্রদাহের সৃষ্টি হয়। **ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকের সংক্রমণে বা এলার্জিজনিত কারণে সাইনাসের মিউকাস পর্দায় যে প্রদাহের সৃষ্টি হয় তাকেই সাইনুসাইটিস বলে।** সাইনুসাইটিসের কারণে মাথা ব্যথা, মুখমন্ডলে ব্যথা, নাক দিয়ে ঘন হলদে বা সবুজাভ তরল ঝরে পড়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

চিত্র ৫.১০ : সাইনুসাইটিস

স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে সাইনুসাইটিস দুরকম :

১. **অ্যাকিউট সাইনুসাইটিস** (Acute sinusitis) : এর স্থায়িত্ব ৪ – ৮ সপ্তাহ।
২. **ক্রনিক সাইনুসাইটিস** (Chronic sinusitis) : এর স্থায়িত্ব ২ মাসের বেশি সময়।

রোগের কারণ

১. সাইনাসগুলো বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস (Human respiratory syncytial virus, Parainflueza virus, Metapneumo virus), ব্যাকটেরিয়া (*Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae*) এবং কিছু ক্ষেত্রে ছত্রাকে আক্রান্ত হলে সাইনুসাইটিস হতে পারে।

২. ঠাণ্ডাজনিত কারণে; অ্যালার্জিজনিত কারণে; ব্যবধায়ক পর্দার অস্বাভাবিকতায় সাইনাস গহ্বর অবরুদ্ধ হয়ে; নাকে **পলিপ** (polyp) সৃষ্টি হলে; নাসাগহ্বরের মিউকোসা স্ফীতির ফলে নাসাপথ সরু হয়ে ক্রনিক সাইনুসাইটিস হতে পারে।
৩. দাঁতের ইনফেকশন থেকে বা দাঁত তুলতে গিয়েও সাইনাসে সংক্রমণ হতে পারে।
৪. যারা হাঁপানির সমস্যায় ভোগে তাদের দীর্ঘস্থায়ী সাইনুসাইটিস দেখা যায়।
৫. সাধারণত ঘরের পোকামাকড়, ধুলাবালি, পেস্ট, তেলাপোকা ইত্যাদি যেসব অ্যালার্জেন ধারণ করে তার প্রভাবে এ রোগের সংক্রমণ দেখা দিতে পারে।
৬. ইউস্টেশিয়ান নালির (eustachian tube) সামান্য অস্বাভাবিকতায় সাইনাস গহ্বর অবরুদ্ধ হয়ে এবং সংক্রমণের ফলে সাইনুসাইটিস হতে পারে।
৭. নাকের হাড় বাঁকা থাকলে অথবা মুখগহ্বরের টনসিল বড় হলে এ রোগ হতে পারে।
৮. সিস্টিক ফাইব্রোসিস এর কারণে এ রোগ হয়।
৯. অপুষ্টি, পরিবেশ দূষণ ও ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের কারণেও এ রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ

১. নাক থেকে হলদে বা সবুজ বর্ণের ঘন তরল বের হয়। এতে পুঁজ বা রক্ত থাকতে পারে।
২. দীর্ঘ ও বিরক্তিকর তীব্র মাথা ব্যথা লেগেই থাকে যা সাইনাসের বিভিন্ন অঞ্চলে হতে পারে।
৩. মাথা নাড়াচাড়া করলে, হাঁটলে বা মাথা নিচু করলে ব্যথার তীব্রতা আরো বেড়ে যায়।
৪. জ্বর জ্বর ভাব থাকে, কোন কিছু ভালো লাগে না বরং অল্পতেই ক্লান্ত লাগে।
৫. নাক বন্ধ থাকে, নিঃশ্বাসের সময় নাক দিয়ে বাজে গন্ধ বের হয়।
৬. মুখমন্ডল অনুভূতিহীন মনে হয়।
৭. মাথাব্যথার সাথে দাঁত ব্যথাও হতে পারে।
৮. কাশি হয়, রাতে কাশির তীব্রতা বাড়ে, গলা ভেঙ্গে যায়।

জটিলতা

সাইনুসাইটিস সংক্রান্ত জটিলতা কেবল নাসিকাগহ্বর ঘিরেই অবস্থান করে না, বরং সাইনাসগুলোর অবস্থান চোখ ও মস্তিষ্কের মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল অঙ্গের সংলগ্ন হওয়ায় জীবাণুর সংক্রমণ শুধু সাইনাসেই সীমাবদ্ধ না থেকে রক্তবাহিত হয়ে চোখ ও মস্তিষ্কে পৌঁছালে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কে সংক্রমণের ফলে মাথাব্যথা, দৃষ্টিহীনতা থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। চোখে সংক্রমণের ফলে পেরিঅরবিটাল ও অরবিটাল সেলুলাইটিসসহ আরও অনেক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

প্রতিকার

স্বেচ্ছাসতর্কতা : সাইনাসে জমাট বেঁধে থাকা তরলকে বিগলিত করে সাইনাসকে চাপমুক্ত ও স্বাভাবিক রাখতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে।

(১) গরম পানিতে ভিজিয়ে, চিপড়ে একখন্ড কাপড় প্রতিদিন বারবার মুখমন্ডলে চেপে ধরা; (২) মিউকাস তরল করতে প্রচুর পানি পান করা; (৩) প্রতিদিন ২-৪ বার নাক দিয়ে বাষ্প টেনে নেওয়া; (৪) দিনে কয়েকবার ন্যাসাল স্যালাইন স্প্রে করা; (৫) আর্দ্রতা প্রতিরোধক ব্যবহার করা; (৬) যন্ত্রের সাহায্যে নাকের ভিতর সবেগে পানি প্রবাহিত করে সাইনাস পরিষ্কার রাখা; (৭) বন্ধ নাক খোলার জন্য ন্যাসাল স্প্রে ব্যবহারে সতর্ক থাকা [প্রথম দিকে ন্যাসাল স্প্রে ভালো কাজ করলেও ৩-৫ দিন একনাগাড়ে ব্যবহার করলে অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে]; (৮) নাক বন্ধ অবস্থায় উড়োজাহাজে না চড়াই ভালো; এবং (৯) মাথা নিচু করে শরীর বাঁকানো অনুচিত।

ওষুধ প্রয়োগ : অ্যাকিউট সাইনুসাইটিসের চিকিৎসায় ওষুধের দরকার হয় না। তবে প্রয়োজনে দু'সপ্তাহের চিকিৎসা চলতে পারে। ক্রনিক সাইনুসাইটিসের চিকিৎসা চলে ৩-৪ সপ্তাহ। ছত্রাকজনিত সাইনুসাইটিসের চিকিৎসায় বিশেষ ধরনের ওষুধ ব্যবহৃত হয়। অ্যান্টিবায়োটিকসহ সমস্ত ঔষধ ব্যবহারে চিকিৎসকের পরামর্শ ও প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী হতে হবে।

কোনো শিশু যদি নাক দিয়ে তরল-নির্গমনসহ ২-৩ সপ্তাহ ধরে কাশিতে, ১০২.২° এ জ্বরে, মাথাব্যথা ও প্রচন্ড চোখফোলা অসুখে ভোগে তাহলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নির্দেশে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগ শুরু করতে হবে।

ওটিটিস মিডিয়া (Otitis media) — মধ্যকর্ণের সংক্রমণ

কানের ভিতরে বা বাইরে যে কোন অংশে সংক্রমণজনিত প্রদাহকে **ওটিটিস** (otitis) বলে। কানের মধ্যকর্ণে সংক্রমণজনিত প্রদাহকে বলা হয় **ওটিটিস মিডিয়া** (otitis media / middle ear infection)। গলবিলের সাথে মধ্যকর্ণের সংযোগ স্থাপনকারী **ইউস্টেশিয়ান নালি** (eustachian tube) টি অধিকাংশ সময়ই বন্ধ থাকে, শুধু ঢোকগেলার সময় খোলা থাকে। কোনো কারণে কোনো জীবাণু এ নালি দিয়ে এসে মধ্যকর্ণে প্রদাহ সৃষ্টি করলে তাকে **ওটিটিস মিডিয়া** বলে। বয়স্কদের তুলনায় শিশুরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

শিশুদের ওটিটিস মিডিয়া তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা–

১. স্বল্পস্থায়ী বা অ্যাকিউট ওটিটিস মিডিয়া : এক্ষেত্রে ইউস্টেশিয়ান নালির প্রতিবন্ধকতার কারণে উর্ধ্ব শ্বাসনালি আক্রান্ত হয় এবং মধ্যকর্ণ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়। দু থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে এ রোগ নিরাময় হয়।

২. দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক ওটিটিস মিডিয়া : এক্ষেত্রে দু থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে রোগ নিরাময় হয় না। রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ রোগে কানের পর্দা ছিদ্র হয়ে পুঁজ বা তরল পদার্থ বেরিয়ে আসে। শ্রবণে ব্যাঘাত ঘটে।

৩. অ্যাডহেসিভ ওটিটিস মিডিয়া : এক্ষেত্রে কানের পর্দা মধ্যকর্ণের কোনো স্থানে বা অস্থির সাথে আটকে যায়। ফলে রোগী বধির হয়ে যায়।

রোগের কারণ

১. প্রধানত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছত্রাকের সংক্রমণে এ রোগ হয়। Respiratory syncytial virus (RSV), Influenza virus, Rhinovirus এবং *Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis* ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটলে।
২. মধ্যকর্ণের সাথে নাকের সংযোগস্থল (eustachian tube) ফুলে বন্ধ হয়ে গেলে।
৩. কোন কারণে অ্যাডিনয়েড (adenoids) ফুলে গেলে।
৪. মাতৃদুগ্ধ পান না করালে বা কম করালে।
৫. শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার কারণে ঠান্ডা লাগলে এবং কানের সংক্রমণ হলে।

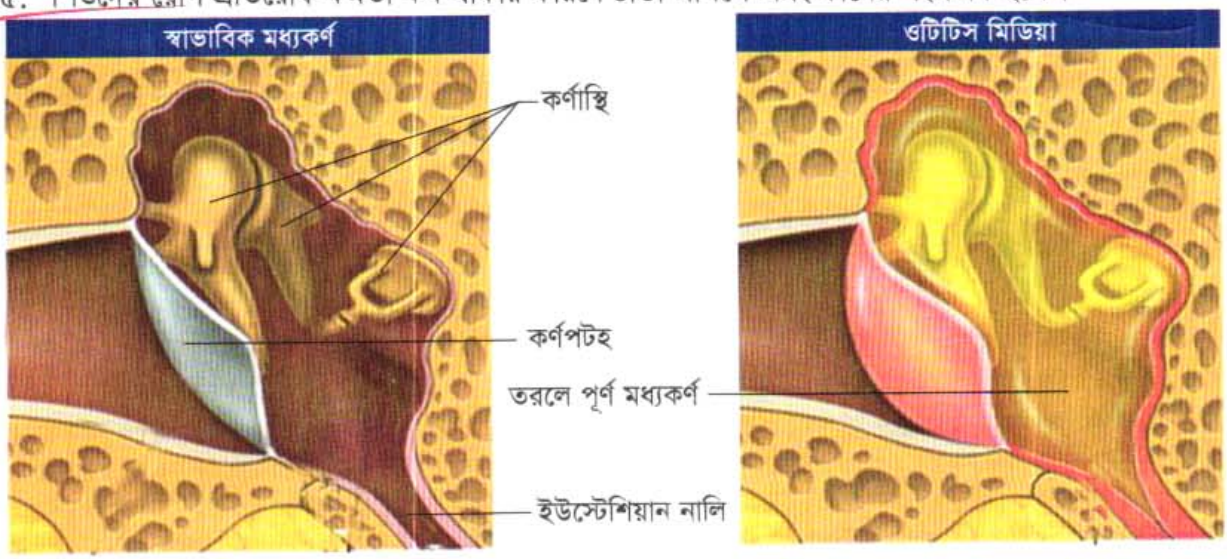

চিত্র ৫.১১ : ওটিটিস মিডিয়া

ওটিটিস মিডিয়া কাদের বেশি হয়

যাদের ওটিটিস মিডিয়া হওয়ার ঝুঁকি বেশি রয়েছে তারা হলো–

১. চার মাস থেকে চার বছর বয়সি শিশুদের।
২. ডে কেয়ার সেন্টারগুলোর মতো জায়গাতে যেখানে একসাথে অনেক শিশু বেড়ে উঠে সেসব শিশুদের।
৩. যেসব শিশুদের নিচু অবস্থানে শুইয়ে বোতলে দুধ খাওয়ানো হয়।
৪. যেসব শিশুরা ধুমপানযুক্ত ও বায়ু দূষণপূর্ণ এলাকায় বাস করে।
৫. পরিবারের অন্য কারো কানে সংক্রমণ হলে শিশুদেরও কানের সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

রোগের লক্ষণ

শিশুদের ক্ষেত্রে

১. কানে ব্যথা হয় এবং কান টানতে থাকে।
২. মাথা ব্যথা হয় ফলে অতিরিক্ত কান্নাকাটি করে।
৩. দেহে বেশি তাপসহ ($104°F^+$) জ্বর থাকে তাই ঘুমাতে পারে না।
৪. নাক দিয়ে পানি ঝরে, কান থেকে দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ বের হয়।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে

১. কানে ব্যথা হয়, কানে চাপ অনুভূত হয় এবং কান ভোঁ ভোঁ করে।
২. মাথা ঝিম ঝিম করে এবং প্রচন্ড মাথা ব্যথা হয়।
৩. কাশি হয় ও নাক দিয়ে পানি ঝরে।
৪. কানে কম শোনে, খাবারে রুচি থাকে না।

ওটিটিস মিডিয়ার জটিলতা

১. কানের পর্দা বা টিমপেনিক পর্দায় ছিদ্র হয়।
২. ছিদ্রপথে মধ্যকর্ণ থেকে গাঢ় তরল পদার্থ গড়িয়ে পড়ে।
৩. কানে কম শোনে।
৪. কানে কম শোনার কারণে শিশুরা সহজে কথা বলা শিখতে পারেনা।

উপদেশ

i. অপ্রয়োজনে কান চুলকানো এড়িয়ে চলা।
ii. গোসলের পূর্বে তুলা তেলে ভিজিয়ে কানে দিয়ে গোসল করা।
iii. ঠান্ডা না নাগানো।
iv. সাতার না কাটা।
v. কান পরিস্কার রাখা।
vi. কানে পানি ঢুকতে না দেয়া।

প্রতিরোধ (Prevention)

১. শিশুর আশেপাশে ধুমপান না করা। কারণ ধুমপায়ীদের শিশুরা ঠান্ডা ও কানের সংক্রমণে বেশি ভুগে থাকে।
২. কানের সংক্রমণ প্রতিরোধে জন্মের পর শিশুকে অন্তত প্রথম ছয়মাস বুকের দুধ খেতে দেয়া। বুকের দুধে রয়েছে রোগ প্রতিরোধক উপাদান। তা ছাড়া ধারণা করা হয় মায়ের দুধে এমন কোনো উপাদান রয়েছে যা পান করার সময় গলার উপর দিকের মিউকাস পর্দা বা ঝিল্লিতে আটকে থাকা ব্যাকটেরিয়াকে নিচের দিকে পাকস্থলিতে নিয়ে আসে। ফলে ব্যাকটেরিয়া উপর দিকে ইউস্টেশিয়ান নালিতে প্রবেশের সুযোগ পায় না।
৩. বুকের দুধ বা অন্য কোনো তরল খাওয়ানোর সময় শিশুর মাথাটি পিঠের সঙ্গে ৪৫ ডিগ্রি কোণে উঁচুতে রাখতে হবে। তা না হলে তরল খাবার ইউস্টেশিয়ান নালি হয়ে কানে ঢুকে সংক্রমণ সৃষ্টি করে।
৪. অ্যালার্জি সৃষ্টি করে এমন কিছু এড়িয়ে চলা। কারণ অ্যালার্জিজনিত প্রতিক্রিয়ার কারণে ইউস্টেশিয়ান নালি বন্ধ হয়ে সংক্রমণ ঘটতে পারে।
৫. গোসলের সময় কানে যাতে পানি প্রবেশ না করে সেদিকে খেয়াল রাখা ও বায়ু দূষণ থেকে দূরে থাকা।
৬. বার বার সর্দি হতে থাকলে এবং নাকের ছিদ্রপথ লালাভ রং এর হলে; শিশু মুখ দিয়ে শ্বাস নিলে এবং রাতে হ্যাঁ করে ঘুমালে শীঘ্রই চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া।
৭. শিশুকালে নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাক্সিন গ্রহণ করে (Pneumococcal conjugate vaccine) *Streptococcus pneumoniae* সৃষ্ট ওটিটিস মিডিয়া রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যেতে পারে।

প্রতিকার (Remedy)

১. চিকিৎসকের পরামর্শ মতো সম্পূর্ণ কোর্সের অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করা। প্রয়োজনে কানের ড্রপ এবং অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।
২. অল্প সময়ের জন্য ব্যথানাশক কোন ওষুধ যেমন– প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।
৩. সতর্কতার সঙ্গে ২/৩ ফোঁটা উষ্ণ মিনারেল অয়েল কানে দেয়া যেতে পারে।
৪. সহনীয় মাত্রায় গরম পানির বোতল চেপে ধরে কানে গরম সেঁক দেয়া। বেশি গরম হলে কাপড়ে বা তোয়ালে পেঁচিয়ে সেঁক দেয়া যেতে পারে।
৫. কান দিয়ে সবসময় পুঁজ পড়ার মতো অবস্থা বার বার ঘটলে নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ (ENT Specialist) চিকিৎসকের মাধ্যমে টিম্পেনোস্টোমি টিউব (Tympanostomy tube) নামে বিশেষ নলের সাহায্যে আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।
৬. কানের পর্দা ছিদ্র হয়ে গেলে Myringoplasty করা যেতে পারে।

ধূমপায়ী ও অধূমপায়ী মানুষের ফুসফুসের এক্স-রের তুলনা
(Comparison Between the X-Ray Film of the Lungs of Smoker and Nonsmoker)

একটি সিগারেটের শলায় প্রায় ৪ হাজার বিভিন্ন রাসায়নিক থাকে। ধূমপানের ফলে এগুলো দেহের ভিতরে, বিশেষ করে ফুসফুসে প্রবেশ করে দেহকে অসুস্থ করতে শুরু করে। সিগারেটে যে রাসায়নিক থাকে তার মধ্যে নিকোটিন, আর্সেনিক, মিথেন, অ্যামোনিয়া, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড ইত্যাদি প্রধান। একজন অধূমপায়ী যে কাজ চটজলদি করতে পারে, সে কাজ ধূমপায়ীর জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ প্রমাণিত হয়। নিচে ধূমপায়ী ও অধূমপায়ী মানুষের এক্স-রের তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

১. **এক্স-রে ফিল্ম :** ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে এটি কোথাও কোথাও সাদাটে বা সাদা, অধূমপায়ীর ক্ষেত্রে এটি কালো।

২. **ফুসফুস :** এক্স-রে দেখে চিকিৎসক ধূমপায়ী ব্যক্তির ফুসফুসে **পানি জমা** (pleural effusion) শনাক্ত করতে পারবেন। এ ধরনের কিছু অধুমপায়ীর এক্স-রে ফিল্মে থাকবে না।

৩. **অ্যালভিওলাই :** ধূমপায়ীদের ফুসফুসের এক্স-রে ফিল্মে অ্যালভিওলাইয়ে সুষম স্বচ্ছতা দেখা যায় না কিন্তু অধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে সুষম স্বচ্ছতা দেখা যায়। তাছাড়া ধূমপায়ীদের ফুসফুসে অধূমপায়ীর চেয়ে কম সংখ্যক অ্যালভিওলাই দেখা যায়। কারণ ধূমপানের ফলে অ্যালভিওলাই নষ্ট হয়ে যায়, কালচে বর্ণ ধারণ করে, কখনওই এগুলোর পূনর্জন্ম হয় না।

৪. **সিলিয়া :** ফুসফুসের অন্তঃপ্রাচীর জুড়ে চুলের মতো **সিলিয়া** (cilia) থাকে। ধূমপায়ীদের সিলিয়া অবশ হয়ে পড়ে, ফলে ধূলি ও কণা ভিতরে জমা হয়। অধূমপায়ীর ক্ষেত্রে এটি ঘটে না তাই ফুসফুস ধূলি-কণা মুক্ত থাকে। এক্স-রে তে এটিও ধরা পড়ে।

চিত্র ৫.১২ : স্বাভাবিক ফুসফুস

চিত্র ৫.১৩ : ধূমপায়ীর ফুসফুস

৫. **প্রাচীর :** এক্স-রে ফিল্মে ধূমপায়ীর ফুসফুস ও অ্যালভিওলাসের প্রাচীর পাতলা ও দুর্বল দেখায়। কিন্তু অধুমপায়ীর এদুটি অংশের প্রাচীর স্বাভাবিক পুরু এবং সবল।

৬. **এমফাইসেমা :** সিগারেটের ধোঁয়ায় অ্যালভিওলাসের প্রাচীরে যে ক্ষতি হয় তার ফলে অ্যালভিওলাস আয়তনে বেড়ে যায় এবং কোনো কোনো স্থান ফেটে ফুসফুসে ফাঁকা স্থান সৃষ্টি করে। এগুলোকে **এমফাইসেমা** (emphysema) বলে। ধূমপায়ীদের এক্স-রে ফিল্মে এমফাইসেমার চিহ্ন দেখা যায় যা অধূমপায়ীদের এক্স-রে ফিল্মে অনুপস্থিত।

৭. **ব্রঙ্কিওল :** ধূমপায়ীর এক্স-রে ফিল্মে ব্রঙ্কিওলের মিউকাস গ্রন্থিগুলোতে বর্ধিত স্ফীতি দেখা যায়। অধূমপায়ীর এক্স-রে ফিল্মে গ্রন্থিগুলোর গঠন স্বাভাবিক দেখায়।

৮. **টিউমার :** ধূমপায়ীদের ফুসফুসের এক্স-রে ফিল্মে অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিউমার উপবৃদ্ধির চিহ্ন দেখা যায় যা অধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

৯. **ক্যান্সার কোষ :** ধূমপায়ীদের ফুসফুসের এক্স-রে ফিল্মে অনেক সময় ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কোষের চিহ্ন দেখা যায় অর্থাৎ কোথাও কোথাও সাদা ঘন জায়গা পরিলক্ষিত হয়। অধূমপায়ীদের এক্স-রে ফিল্মে সাধারণত ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কোনো ধরনের কোষের চিহ্ন দেখা যায় না।

কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস (Artificial Respiration)

কোনো কারণে কারও শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে এমন জরুরী পরিস্থিতিতে সে ব্যক্তির মুখ বা নাক দিয়ে যান্ত্রিক বা কায়িক ছন্দময় প্রক্রিয়ায় বাতাস অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে বা বের করে দিয়ে পুনরায় শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগে সক্ষম করে তুলে ভুক্তভোগি ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তোলাই হচ্ছে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের উদ্দেশ্য। বিপদ-আপদ বলে কয়ে আসে না, তাই কিছু প্রাথমিক চিকিৎসা সবারই জেনে রাখা ভাল। কোনো দুঃসময় বা দুর্গমস্থানে কারও শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে

৭ অধ্যায়

মানব শারীরতত্ত্ব : চলন ও অঙ্গচালনা
Human Physiology : Locomotion & Movement

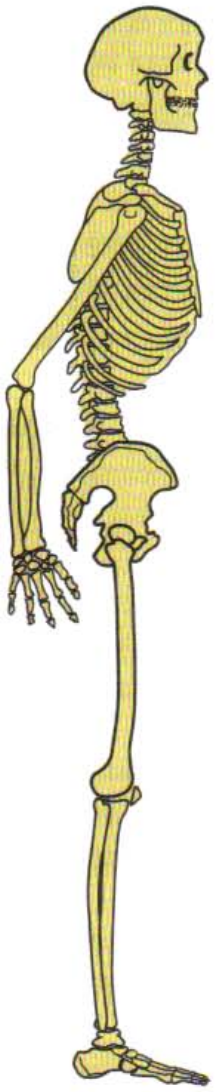

চলন ও **অঙ্গচালনা** প্রাণিদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এদুটি কাজ সম্পাদনে প্রধানত তিনটি অঙ্গতন্ত্র সক্রিয় থাকে কঙ্কালতন্ত্র, পেশিতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র। চলাফেরা, খাদ্য অন্বেষণ, আত্মরক্ষা, প্রজনন প্রভৃতি যাবতীয় কাজকর্মের সবই **কঙ্কাল-পেশি** ক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। কঙ্কাল-পেশির সংকোচন ও প্রসারণের ফলে অঙ্গের বা দেহাংশের চলন ঘটে। মানবদেহের ভারবহনকারী শক্ত কাঠামোটি হচ্ছে **কঙ্কালতন্ত্র**। আর এ কঙ্কালতন্ত্রের উপর আচ্ছাদন থাকে **পেশিতন্ত্রের**। এ অধ্যায়ে মানুষের কঙ্কালতন্ত্র গঠনকারী অস্থি, তরুণাস্থি ও পেশির সমন্বিত ক্রিয়া এবং অস্থিভঙ্গ ও সন্ধির আঘাত নিয়ে আলোচনা করা হবে।

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- অস্থিসন্ধি
- প্যাটেলা
- মচকানো
- টেনডন
- লিগামেন্ট
- অস্থিভঙ্গ

পিরিয়ড সংখ্যা-১২ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. মানুষের কঙ্কালতন্ত্রের প্রধান অংশসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।	● মানুষের কঙ্কালতন্ত্র ○ প্রধান ভাগ ○ অস্থি ও তরুণাস্থির গঠন
২. অস্থি ও তরুণাস্থির গঠনের তুলনা করতে পারবে।	
৩. **ব্যবহারিক :** মানুষের কঙ্কালতন্ত্রের অস্থিসমূহ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে।	● **ব্যবহারিক** ○ মানুষের বিভিন্ন অস্থি (মডেল)পর্যবেক্ষণ
৪. বিভিন্ন প্রকার পেশির গঠন ও কাজের তুলনা করতে পারবে।	● পেশির গঠন ও কাজ ○ প্রধান ভাগ ○ মসৃণ ○ হৃদ ○ কঙ্কাল
৫. পেশিতে টান পড়ে কিন্তু ধাক্কা দেয় না ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● পেশিতে টান পড়ে কিন্তু ধাক্কা দেয়না
৬. **ব্যবহারিক :** প্রস্তুতকৃত স্লাইডের সাহায্যে মসৃণ ও হৃৎপেশির কাঠামোর তুলনা করতে পারবে।	● **ব্যবহারিক** ○ প্রস্তুতকৃত স্লাইডের সাহায্যে মসৃণ ও হৃদপেশির কাঠামোর তুলনা
৭. কঙ্কালের প্রধান কার্যক্রম 'রডস ও লিভার' একটি তন্ত্র হিসেবে কাজ করে বিশ্লেষণ করতে পারবে।	● কঙ্কালের কার্যক্রম ও 'রডস ও লিভার' তন্ত্র
৮. মানুষের হাঁটু সঞ্চালনে অস্থি ও পেশির সমন্বয় ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● হাঁটু সঞ্চালনে অস্থি ও পেশির সমন্বয়
৯. বিভিন্ন ধরনের অস্থিভঙ্গ এবং এদের প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● অস্থিভঙ্গ এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ○ সাধারণ ○ যৌগিক ○ জটিল
১০. বিভিন্ন ধরনের অস্থিসন্ধিতে আঘাত ও এদের প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● সন্ধির আঘাত এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ○ স্থানচ্যুতি ○ মচকানো

মানব কঙ্কালতন্ত্র (Human Skeletal System)

ভ্রূণীয় মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত **অস্থি** ও **তরুণাস্থি** (কার্টিলেজ) নামক যোজক টিস্যু সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্র দেহের কাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে দেহকে নির্দিষ্ট আকৃতি দান করে, দেহের ভার বহন করে, পেশি সংযোগের স্থান প্রদান করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন অঙ্গসমূহ রক্ষা করে তাকে **কঙ্কাল তন্ত্র** বলে। মানবদেহের কঙ্কাল মূলত **অন্তঃকঙ্কাল**। বাইরে থেকে অন্তঃকঙ্কাল দেখা যায় না।

কঙ্কালতন্ত্রের কাজ (Functions of skeletai system)

ক. যান্ত্রিক কাজ (Mechanical functions)

১. **দৈহিক কাঠামো গঠন :** কঙ্কালতন্ত্র মানবদেহের কাঠামো গঠন ও নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করে।

২. **সুরক্ষা :** মানবদেহের গুরুত্বপুর্ণ অঙ্গাদে যেমন মস্তিষ্ক, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, সুষুম্নাকাণ্ড প্রভৃতি বিশেষভাবে নির্মিত কঙ্কালে সুরক্ষিত থাকে।

৩. **সংযোগতল সৃষ্টি :** দেহের অধিকাংশ পেশি, লিগামেন্ট ও টেনডন কঙ্কালে সংযুক্ত থেকে বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটায়।

৪. **চলন :** অস্থিসন্ধি গঠন এবং পেশির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কঙ্কালতন্ত্র মানুষের চলনে প্রধান ভূমিকা রাখে।

৫. **ভারবহন :** পেশিসমূহ কঙ্কালের সাথে আটকে থেকে দেহের ভার বহন করে।

খ. শারীরবৃত্তীয় কাজ (Physiological functions)

৬. **রক্ত কণিকা উৎপাদন :** পরিণত মানব দেহের রক্ত উৎপাদনকারী প্রধান টিস্যু হচ্ছে **লাল অস্থিমজ্জা**। স্টার্নাম, পাঁজর, কশেরুকা, করোটি এবং ফিমার ও হিউমেরাসের মস্তকে অবস্থিত অস্থিমজ্জা থেকে লোহিত কণিকা উৎপন্ন হয়। অস্থিমজ্জা থেকে প্রতি সেকেন্ডে গড়ে প্রায় ২৬ লক্ষ লোহিত কণিকা সৃষ্টি হয়। অবিরামভাবে লোহিতা কণিকা উৎপাদন ছাড়াও লাল অস্থিমজ্জা অণুচক্রিকা উৎপন্ন করে এবং ম্যাক্রোফেজ ধারণ করে।

৭. **শ্রবণ :** কঙ্কালতন্ত্র কিছু শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। বক্ষপিঞ্জর শ্বাস-প্রশ্বাসে এবং মধ্যকর্ণের কর্ণাস্থি শ্রবণে সহায়তা করে।

৮. **রোগ প্রতিরোধ :** অস্থির রেটিক্যুলো এন্ডোথেলিয়ালতন্ত্র দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় অংশ নেয়।

৯. **খনিজ লবণ সঞ্চয় :** ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়াম সঞ্চয় করে এবং প্রয়োজনে রক্তে সরবরাহ করে।

১০. **চাপ ও আয়নিক সমতা রক্ষা :** দেহের অভ্যন্তরীণ চাপ নিয়ন্ত্রণে ও আয়নিক সমতা রক্ষায় অস্থিসমূহ কাজ করে।

১১. **হরমোনাল নিয়ন্ত্রণ :** অস্থির কোষ থেকে **অস্টিওক্যালসিন** (osteocalcin) নামক হরমোন ক্ষরিত হয় যা দেহে রক্তের চিনি ও চর্বির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

১২. **রাসায়নিক শক্তি : মানুষের** বয়স বাড়ার সাথে সাথে কিছু লোহিত অস্থিমজ্জা পরিবর্তিত হয়ে পীত অস্থিমজ্জা (yellow bone marrow) গঠন করে। পীত অস্থিমজ্জায় প্রচুর পরিমাণে **অ্যাডিপোজ কোষ** (adepose cell) থাকে যেগুলো দেহের সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তির আধার হিসেবে ভূমিকা রাখে।

কঙ্কালতন্ত্রের উপাদান

কঙ্কালতন্ত্র পাঁচ ধরনের তন্তুময় ও খনিজসমৃদ্ধ প্রধান উপাদান নিয়ে গঠিত।

১. **অস্থি** (Bone) : অস্থি কঙ্কালতন্ত্রে উপস্থিত সুদৃঢ় যোজক টিস্যু যা প্রধানত ক্যালসিয়াম লবণ দিয়ে গঠিত।

২. **কোমলাস্থি** বা **তরুণাস্থি** (Cartilage) : কোমলাস্থি কঙ্কালতন্ত্রে অবস্থিত স্থিতিস্থাপক ধরনের যোজক টিস্যু। তবে এতে সাধারণত কোন ক্যালসিয়াম থাকে না।

৩. **লিগামেন্ট** (Ligament) : লিগামেন্ট বা অস্থিবন্ধনী হচ্ছে ঘন, শ্বেত বর্ণের তন্তুময় ও স্থিতিস্থাপক বন্ধনী যা দিয়ে একটি অস্থি অন্য একটি অস্থির সাথে যুক্ত থাকে। এগুলো বিভিন্ন অঙ্গকে সঠিক স্থানে ধরে রাখতে সহায়তা করে।

৪. **টেনডন** (Tendon) : টেনডন হলো ঘন, মজবুত, শ্বেত বর্ণের নমনীয় ও অস্থিতিস্থাপক তন্তুময় যোজক টিস্যু যেগুলো মাংসপেশির প্রান্তে অবস্থান করে পেশি ও অস্থির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

৫. **অস্থিসন্ধি** (Joint) : একটি অস্থি অন্য একটি অস্থির সাথে সংযুক্ত হয়ে যে সন্ধিস্থল গঠন করে তাকে অস্থিসন্ধি বলে। অস্থিসন্ধি থাকার কারণে দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে বিভিন্ন মাত্রায় সঞ্চালন করা যায় ফলে চলন, নড়ন, ভারবহন ও বিভিন্ন কাজকর্ম সহজ হয়।

কঙ্কালতন্ত্রের প্রধান ভাগ

মানব কঙ্কালতন্ত্রের অধিকাংশই অস্থি নির্মিত। মোট ২০৬টি অস্থি নিয়ে গঠিত সমগ্র কঙ্কালতন্ত্রকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা– ১. **অক্ষীয় কঙ্কাল** (Axial skeleton) এবং ২. **উপাঙ্গীয় কঙ্কাল** (Appendicular skeleton)।

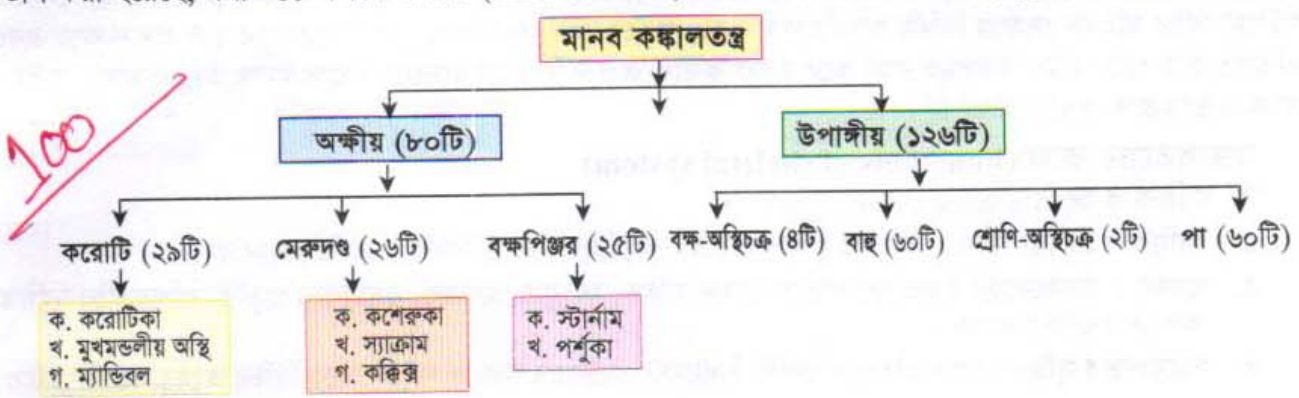

পরিণত মানব কঙ্কালের অস্থিসমূহ (Bones of Adult Human Skeleton)

প্রধান ভাগ	অন্তর্ভুক্ত অংশ		বিন্যাস ও সংখ্যা		মোট সংখ্যা
অক্ষীয় কঙ্কাল (৮০টি)	করোটি ২৯টি	করোটিকা	ফ্রন্টাল অস্থি	১টি	৮টি
			প্যারাইটাল অস্থি	২টি	
			টেমপোরাল অস্থি	২টি	
			অক্সিপিটাল অস্থি	১টি	
			স্ফেনয়েড অস্থি	১টি	
			এথময়েড অস্থি	১টি	
		মুখমণ্ডলীয় অস্থি	ম্যাক্সিলা	২টি	১৪ টি
			ম্যান্ডিবল	১টি	
			জাইগোম্যাটিক অস্থি	২টি	
			ন্যাসাল অস্থি	২টি	
			ল্যাক্রিমাল অস্থি	২টি	
			ইনফিরিয়র ন্যাসাল কঙ্কা	২টি	
			ভোমার	১টি	
			প্যালেটিন অস্থি	২টি	
		কর্ণাস্থি	ম্যালিয়াস	২টি	৬ টি
			ইনকাস	২টি	
			স্টেপিস	২টি	
		হাইওয়েড		১ টি	১ টি
	মেরুদন্ড		সারভাইকাল কশেরুকা	৭টি	২৬টি (৩৩ টি)
			থোরাসিক কশেরুকা	১২টি	
			লাম্বার কশেরুকা	৫টি	
			স্যাক্রাল কশেরুকা	১টি (৫টি)	
			কক্সিক্স	১টি (৪টি)	
	বক্ষপিঞ্জর		স্টার্নাম	১টি	২৫ টি
			পর্শুকা (প্রতিপাশে ১২টি)	২৪টি	
উপাঙ্গীয় কঙ্কাল (১২৬টি)	বক্ষ-অস্থিচক্র		স্ক্যাপুলা	২টি	৪টি
			ক্ল্যাভিকল	২টি	
	বাহু (দুটি)		হিউমেরাস	২টি	৬০টি
			রেডিয়াস	২টি	
			আলনা	২টি	
			কার্পাল	১৬টি	
			মেটাকার্পাল	১০টি	
			ফ্যালাঞ্জেস	২৮টি	
	শ্রোণি-অস্থিচক্র		ইলিয়াম	১টি	২টি
			ইশ্চিয়াম	১টি	
			পিউবিস	১টি	
			(প্রতিপাশের অস্থিগুলো (৩+৩) মিলিত হয়ে একটি করে হিপ বোন গঠন করে। সে হিসেবে দুপাশে দুটি হিপ বোন থাকে)		
	পা (দুটি)		ফিমার	২টি	৬০টি
			টিবিয়া	২টি	
			ফিবুলা	২টি	
			প্যাটেলা	২টি	
			টার্সাল	১৪টি	
			মেটাটার্সাল	১০টি	
			ফ্যালাঞ্জেস	২৮টি	
					সর্বমোট = ২০৬ টি

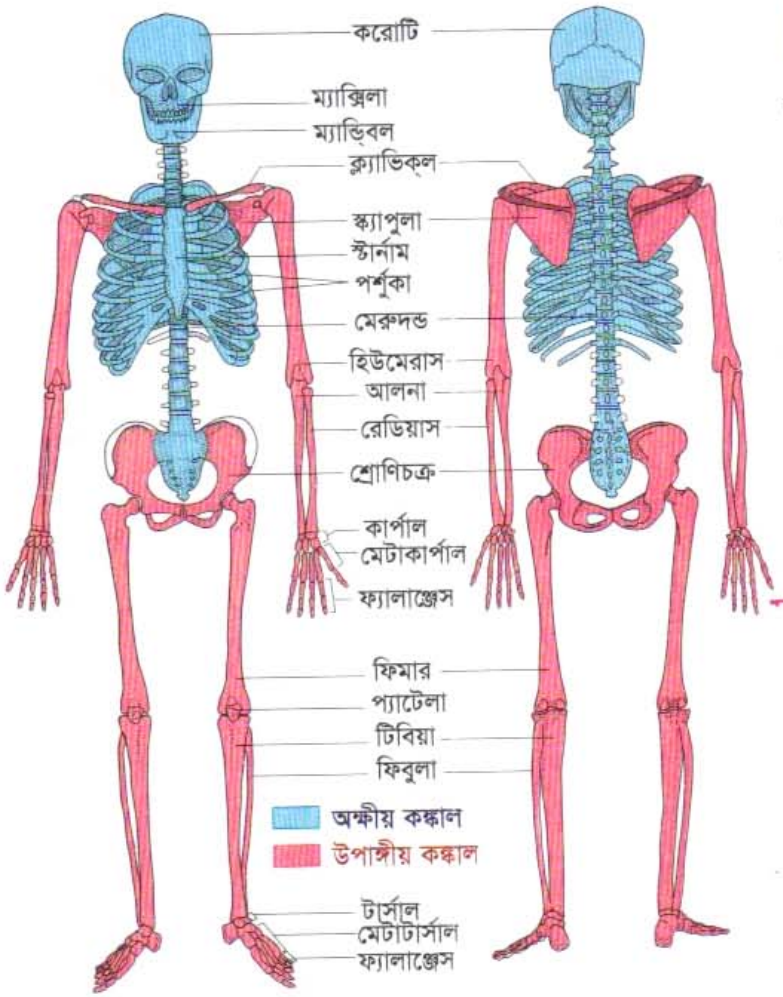

চিত্র ৭.১ : মানব কঙ্কাল (বায়ে-সম্মুখদৃশ্য; ডানে-পশ্চাৎদৃশ্য)

১. অক্ষীয় কঙ্কাল (Axial Skeleton)

কঙ্কালতন্ত্রের যে অস্থিগুলো দেহের লম্বঅক্ষ বরাবর অবস্থান করে কোমল, নমনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোকে ঘিরে রাখে এবং দেহকান্ডের বিভিন্ন অংশকে যুক্ত করে অবলম্বন দান করে সেগুলোকে একত্রে **অক্ষীয় কঙ্কাল** বলে।

অক্ষীয় কঙ্কাল করোটি, মেরুদন্ড এবং বক্ষপিঞ্জর-এ বিভক্ত। নিচে এসব অংশের বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. করোটি (Skull)

মুখমণ্ডলীয় ও করোটিকা-অস্থি নিয়ে গঠিত মাথার কঙ্কালিক গঠনকে করোটি বলে। ২৯টি অস্থি নিয়ে **করোটি** গঠিত। করোটির অস্থিগুলো **করোটিকা** বা খুলির অস্থি এবং **মুখমন্ডলীয় অস্থি** এ দুভাগে বিভক্ত।

i. করোটিকা (Cranium)

করোটির যে অংশ মস্তিষ্ক আবৃত করে রাখে তাকে **করোটিকা** বলে। ছয় ধরনের মোট আটটি সুগঠিত, চাপা ও শক্ত অস্থি নিয়ে করোটিকা গঠিত। অস্থিগুলো খাঁজকাটা কিনারাযুক্ত হওয়ায় একত্রে ঘন সন্নিবেশিত ও একে অন্যের সাথে **সূচার সন্ধির** (suture joint) মাধ্যমে দৃঢ়সংলগ্ন থাকে।

করোটিকা যে সব অস্থি নিয়ে গঠিত সেগুলো হচ্ছে– কপাল নির্মাণকারী বড় ঝিনুকের মতো একটি **ফ্রন্টাল** (frontal), চারকোণা পেটের মতো দুটি **প্যারাইটাল** (parietal), চার অংশে বিভক্ত দুটি **টেমপোরাল** (temporal), খোলসের মতো একটি **অক্সিপিটাল** (occipital), ডানার মতো একটি **স্ফেনয়েড** (sphenoid) এবং ছিদ্রাল আড়াআড়ি প্লেটের মতো একটি **এথময়েড** (ethmoid)।

কাজ : করোটিকা মস্তিষ্ককে আবৃত ও সুরক্ষিত করে।

ii. মুখমন্ডলীয় অস্থি (Facial bones)

করোটিকার সামনের ও নিচের দিকের অংশ মুখমন্ডল। একটি জোড়অস্থি বা **ম্যাক্সিলা** (উর্ধ্বচোয়াল), U আকৃতির একটি **ম্যান্ডিবল** (mandible; নিম্নচোয়াল), চারকোণা দুটি **জাইগোম্যাটিক** (zygomatic), আয়তাকার দুটি **ন্যাসাল** (nasal), খাদ ও ঝুঁটি সম্বলিত **ল্যাক্রিমাল** (lacrimal), চারকোণা একটি **ভোমার** (vomer) এবং অনুলম্ব প্লেটে গঠিত দুটি **প্যালেটিন** (palatine) নিয়ে মুখমন্ডল গঠিত।

কাজ : মুখমন্ডলীর অস্থিগুলো সুসজ্জিত হয়ে চোখ, কান, নাক ও মুখগহ্বর সৃষ্টি করে।

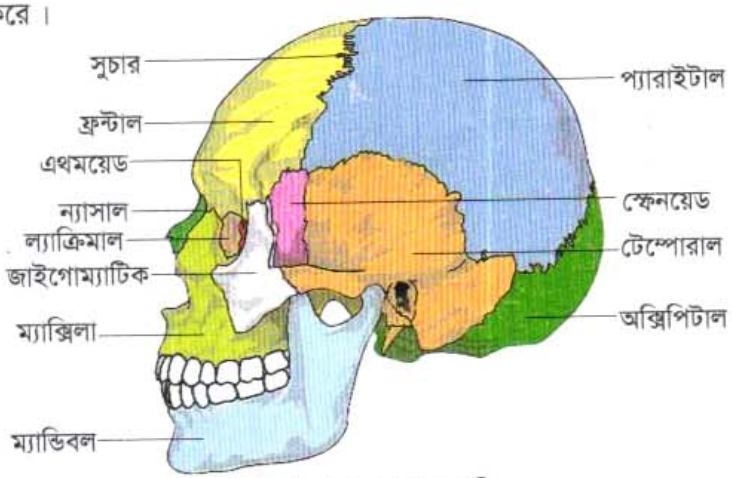

চিত্র ৭.২ : মানুষের করোটি

খ. মেরুদন্ড (Vertebral Column)

অ্যাটলাস (atlas) থেকে **কক্কিক্স** (coccyx) পর্যন্ত প্রলম্বিত, সুষুম্না কান্ড (spinal cord) কে ঘিরে অবস্থিত একসারি কশেরুকা নিয়ে গঠিত এবং দেহের অক্ষকে অবলম্বনদানকারী অস্থিময় ও নমনীয় গঠনকে **মেরুদণ্ড** বলে। মেরুদন্ডকে শিরদাঁড়া, স্পাইন, স্পাইনাল কলাম প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। ৩৩টি অনিয়ত আকৃতির অস্থিখন্ড নিয়ে মেরুদণ্ড গঠিত। মেরুদন্ডের প্রত্যেকটি অস্থিখন্ডককে **কশেরুকা** (vertebra, বহুবচনে vertebrae) বলে।

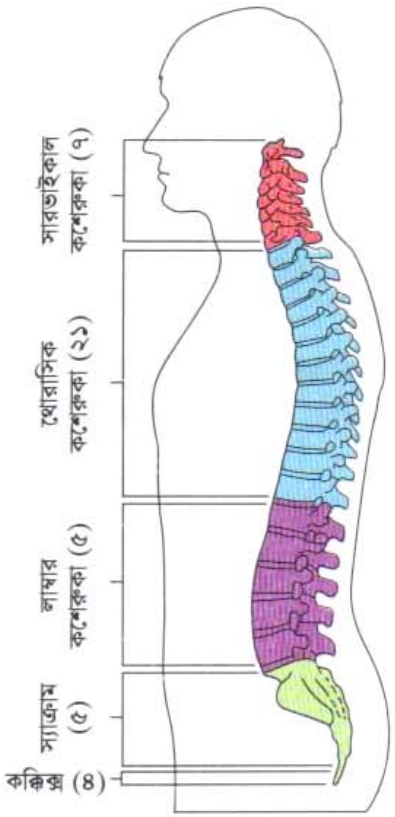

চিত্র ৭.৩ : মানুষের মেরুদণ্ড (পার্শ্বদৃশ্য)

একটি আদর্শ কশেরুকার গঠন

দেহের বিভিন্ন অঞ্চলের এমনকি একই অঞ্চলের বিভিন্ন কশেরুকায়ও পার্থক্য দেখা যায়। তা সত্ত্বেও সকল কশেরুকাই একটি মৌলিক গড়নের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিচে মানুষের একটি আদর্শ কশেরুকার (মধ্য-বক্ষদেশীয় কশেরুকা) বর্ণনা দেয়া হলো।

১. **সেন্ট্রাম** (Centrum) বা **ভার্টিব্রাল বডি** (Vertebral body): এটি কশেরুকার বৃহত্তম ও সম্মুখস্থ স্থূল অংশ, দেখতে ডিম্বাকার রডের একটি খন্ডের মতো। কোমলাস্থি নির্মিত সিমফাইসিস (symphysis) বা আন্তঃকশেরুকীয় চাকতি (intervertebral disc)-র সাহায্যে সমস্ত কশেরুকার দেহ পরস্পরের সঙ্গে আটকে থাকে। সেন্ট্রাম শক্ত, পুরু ও স্পঞ্জি অস্থিতে গঠিত।

২. **আর্চ** (Arch) : এটি কশেরুকা-দেহের পৃষ্ঠতলে অবস্থিত রিংয়ের মতো গঠন। আর্চ নিম্নোক্ত অংশগুলো ধারণ করে।

- **পেডিকল** (Pedicle) : কশেরুকা-দেহের উভয় পশ্চাৎ-পার্শ্ব থেকে উত্থিত ও পিছনে বর্ধিত খাটো শক্ত গঠন।
- **ট্রান্সভার্স প্রসেস** (Transverse process) : উভয় পাশে পেডিকল ও ল্যামিনার সংযোগস্থল থেকে উত্থিত পার্শ্বীয় প্রবর্ধন।
- **ল্যামিনা** (Lamina) : উভয় পাশে ট্রান্সভার্স ও স্পাইনাস প্রসেসের মাঝখানে অবস্থিত চওড়া, চাপা, তির্যক ও ঢালু প্লেটের মতো অস্থি।
- **আর্টিকুলার প্রসেস** (Articular process) : উভয় পাশে ল্যামিনা ও পেডিকলের সংযোগস্থল থেকে উদগত একটি সুপিরিয়র ও একটি ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস। একটি কশেরুকার সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস অন্য কশেরুকার ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেসের সংগে যুক্ত থাকে।
- **স্পাইনাস প্রসেস** (Spinous process): দুই ল্যামিনির সংযোগস্থল থেকে একটি পশ্চাৎ মধ্যরেখীয় প্রবর্ধন যা নিম্নমুখী প্রসারিত। ২য়-৬ষ্ঠ সারভাইকাল কশেরুকার এ প্রসেস প্রান্তের দিকে দ্বিখন্ডিত।

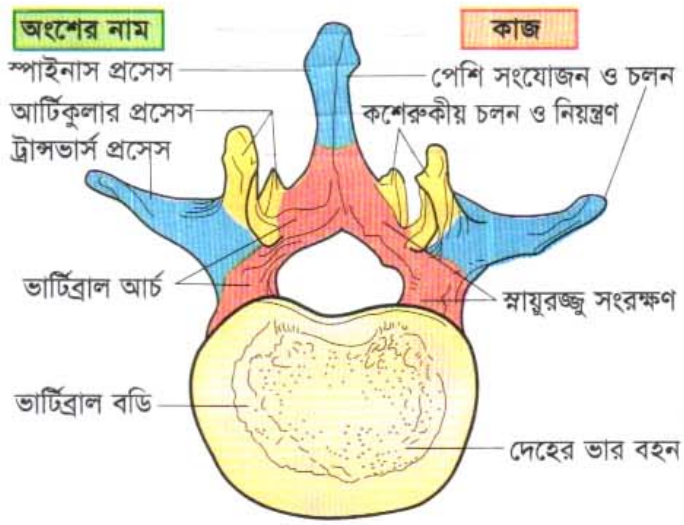

চিত্র ৭.৪ : একটি আদর্শ কশেরুকা (৫ম থেকে ৮ম বক্ষীয় কশেরুকা)

কশেরুকার ছিদ্রপথ ও নালি : পেডিকলের উর্ধ্ব ও নিম্নদেশে যে খাঁজ (notch) থাকে তা সম্মিলিতভাবে **ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন** (intervertebral foramen) গঠন করে। এ ছিদ্রের ভিতর দিয়ে সুষুম্না স্নায়ু ও রক্তবাহিকা অতিক্রম করে। কশেরুকার যে বড় ছিদ্রটি সামনে দেহ, পিছনে আর্চ ও পাশে পেডিকলে নির্মিত, তাকে **ভার্টিব্রাল ফোরামেন** (vertebral foramen) বলে। সকল কশেরুকার ছিদ্র সম্মিলিতভাবে **ভার্টিব্রাল ক্যানেল** (vertebral canal) নির্মাণ করে। এর ভিতরে **ঝিল্লিসহ সুষুম্না কান্ড** (spinal cord) ও রক্তনালিকা সুরক্ষিত থাকে।

কশেরুকার প্রকারভেদ (Types of Vertebrae)

অবস্থান অনুযায়ী কশেরুকাগুলোকে নিম্নোক্ত ৫টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়ে থাকে;

১. **সারভাইকাল (গ্রীবাদেশীয়) কশেরুকা** (Cervical vertebrae) ..... ৭টি
২. **থোরাসিক (বক্ষদেশীয়) কশেরুকা** (Thoracic vertebrae) ..... ১২টি
৩. **লাম্বার (কটিদেশীয়) কশেরুকা** (Lumbar vertebrae) ..... ৫টি
৪. **স্যাক্রাল (শ্রোণিদেশীয়) কশেরুকা** (Sacral vertebrae) ..... ১টি (৫টি একীভূত)
৫. **কক্কিজিয়াল (পুচ্ছদেশীয়) কশেরুকা** (Coccygeal vertebrae) ..... ১টি (৪টি একীভূত)

মোট ২৬ টি

পরিণত বয়সে স্যাক্রাল কশেরুকাগুলো একীভূত হয়ে **স্যাক্রাম** (sacrum) এবং কক্কিজিয়ালগুলো **কক্কিক্স** (coccyx) গঠন করে। ফলে, সর্বমোট কশেরুকার সংখ্যা কমে ২৬টি হয়। **ব্যবহারিক অংশে বিভিন্ন ধরনের কশেরুকার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।**

মেরুদন্ডের কাজ

- দেহকান্ডের সুষ্ঠু সঞ্চালনে মজবুত ও নমনীয় অবলম্বন হিসেবে কাজ করে।
- সুষুম্না কান্ড ও সুষুম্না স্নায়ুমূলকে বেষ্টন ও রক্ষা করে।
- মাথাকে অবলম্বন দেয় এবং **পিভট** (pivot)-এর মতো কাজ করে।
- পর্শুকা সংযোগের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দেহের অক্ষরূপে কাজ করে।
- দেহের ভঙ্গি দানে ও চলাফেরায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ. বক্ষপিঞ্জর (Thoracic cage)

পর্শুকাগুলো একদিকে থোরাসিক কশেরুকা ও অন্যদিকে স্টার্নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে খাঁচার মতো আকৃতি দান করে, তাকে **বক্ষপিঞ্জর** বলে। মানুষের বক্ষপিঞ্জর একটি **উরঃফলক** বা **স্টার্নাম** (sternum), ১২ জোড়া **পর্শুকা** (ribs) এবং ১২টি **থোরাসিক কশেরুকা** নিয়ে গঠিত হয়।

- **স্টার্নাম :** বুকের কেন্দ্রীয় সম্মুখ অংশে অবস্থিত চাপা অস্থিটি স্টার্নাম। এটি ৩ অংশে বিভক্ত–উপরের ত্রিকোণা **ম্যানুব্রিয়াম;** মাঝের লম্বা **দেহ;** এবং নিচের ক্ষুদ্র **জিফয়েড প্রসেস**। ম্যানুব্রিয়াম দেহের সাথে সূক্ষ্মকোণ সৃষ্টি করে সম্মুখে প্রসারিত।

স্টার্নামের উর্ধ্ব প্রান্তে একটি খাঁজ থাকে যা জুগুলার নচ নামে পরিচিত এবং পার্শ্ব কিনারায় ক্ল্যাভিকলের এবং ৭ জোড়া পর্শুকার খাঁজ থাকে।

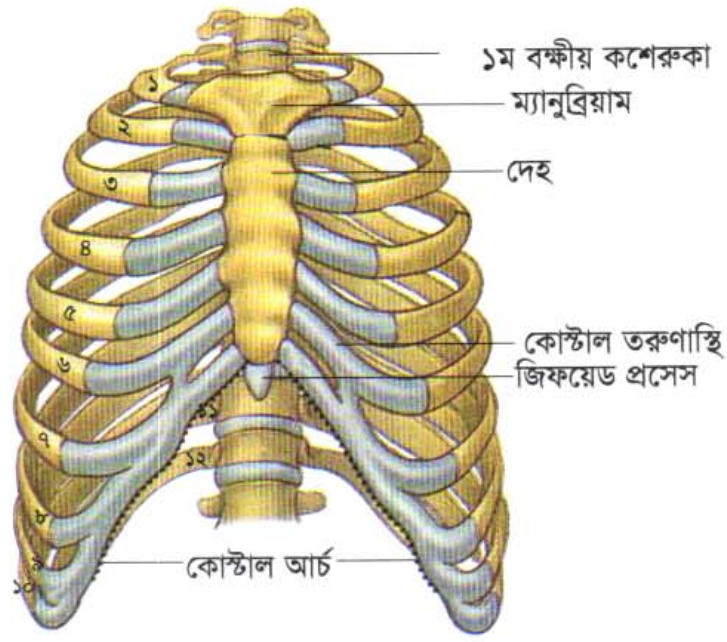

চিত্র ৭.৫ : বক্ষপিঞ্জর

পর্শুকা : পর্শুকাগুলো লম্বা, সরু, চাপা ও বাঁকা অস্থি। মানুষের দেহে ১২ জোড়া পর্শুকা থাকে। একটি আদর্শ পর্শুকা পশ্চাৎপ্রান্তে ফ্যাসেটবাহী **মস্তক** (ক্যাপিচুলাম), ক্রেস্টবাহী **গ্রীবা**, সংযোগী তলসহ **টিউবার্কল** এবং কোণ সৃষ্টি করে বাঁকানো **দেহ** নিয়ে গঠিত। মস্তক থোরাসিক কশেরুকার দেহের সাথে এবং টিউবার্কল দিয়ে একই কশেরুকার ট্রান্সভার্স প্রসেসের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

পর্শুকার সম্মুখ প্রান্ত তরুণাস্থিময়। প্রথম ৭ জোড়া পর্শুকা এদের তরুণাস্থি দিয়ে স্টার্নামের সাথে যুক্ত থাকে, এগুলো **আসল** (প্রকৃত) পর্শুকা। বাকি ৫ জাড়া (৮ম–১২শ) স্টার্নামের সাথে যুক্ত নয় বলে তা **নকল** পর্শুকা। ৮ম, ৯ম ও ১০শ পর্শুকা উপরস্থিত পর্শুকার তরুণাস্থির সাথে একীভূত হয়ে **কোস্টাল আর্চ** (costal arch) নির্মাণ করে। ১১শ ও ১২শ পর্শুকা সামনে মাংসপেশিতে উন্মুক্ত থাকে। এগুলো সরল, ক্ষুদ্র ও **ভাসমান** পর্শুকা নামে অভিহিত। প্রকৃত পর্শুকার দৈর্ঘ্য উপর থেকে নিচে ক্রমশ বাড়তে থাকে, কিন্তু নকল পর্শুকার ক্ষেত্রে ঘটে উল্টো ঘটনা।

চিত্র ৭.৬ : একটি পর্শুকা

পর্শুকার অন্তর্তলের নিচের কিনারায় কোস্টাল খাঁজে স্নায়ু ও রক্তবাহিকা অবস্থান করে। প্রথম পর্শুকা জোড়ার উপরতলে পেশি সংযোজনের জন্য দুটি এবং সাবক্ল্যাভিয়ান ধমনি ও শিরা ধারণের জন্য দুটি খাঁজ থাকে। বহিঃ ও অন্তঃ ইন্টারকোস্টাল পেশি প্রতি দুই কশেরুকার মধ্যে তির্যকভাবে বিন্যস্ত। উপরে ও নিচে দুই কোস্টাল তরুণাস্থির মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানটি **ইন্টারকোস্টাল স্পেস**।

বক্ষপিঞ্জরের কাজ : হৃৎপিন্ড, ফুসফুস প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বক্ষপিঞ্জরের ভিতরে সুরক্ষিত থাকে।

২. উপাঙ্গীয় কঙ্কাল (Appendicular Skeleton)

উর্ধ্বাঙ্গ (দুই বাহু ও বক্ষ-অস্থিচক্র) ও **নিম্নাঙ্গ** (দুই পা ও শ্রোণি-অস্থিচক্র)-এর অস্থিগুলোকে একত্রে **উপাঙ্গীয় কঙ্কাল** বলে।

উর্ধ্বাঙ্গের অস্থিসমূহ

বক্ষ–অস্থিচক্র ও **দুবাহু** নিয়ে উর্ধ্বাঙ্গ গঠিত। দেহের উভয় পাশের ৩২টি করে মোট ৬৪টি অস্থি উর্ধ্বাঙ্গের অন্তর্গত।

ক. বক্ষ-অস্থিচক্র (Pectoral Girdle)

মানুষের বক্ষ–অস্থিচক্র ২ জোড়া অস্থি নিয়ে গঠিত, যথা–একজোড়া **ক্ল্যাভিকল** (clavicle) ও একজোড়া **স্ক্যাপুলা** (scapula)।

ক্ল্যাভিকল দেখতে ইটালিক '*f*' এর মতো বাঁকা অস্থি। এটি একটি দেহ ও দুটি প্রান্ত, যথা **স্টার্নাল** (স্টার্নামের ম্যানুব্রিয়ামে যুক্ত থাকে) এবং **অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস** (স্ক্যাপুলায় যুক্ত থাকে) নিয়ে গঠিত।

স্ক্যাপুলা দেখতে চাপা ও ত্রিকোণা অস্থি। এর একটি সম্মুখ বা **কোস্টাল তল** (costal surface), একটি পশ্চাৎ তল বা **কোরাকয়েড প্রসেস** (coracoid process), একটি **অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস** (acromial process) এবং **গ্লিনয়েড গহ্বর** (glenoid cavity) নামে একটি সংযোগী অবতল আছে।

সম্মুখ তল পর্শুকাগুলোর দিকে মুখ করে থাকে। এতে **সাবস্ক্যাপুলার ফসা** (subscapular fossa) নামে একটি অবতল অংশ আছে। গ্লেনয়েড গহ্বরে হিউমেরাসের মস্তক আটকানো থাকে।

পশ্চাৎতলে **স্ক্যাপুলার কাঁটা** (spine of scapula) থাকে যা স্ক্যাপুলার পশ্চাৎতলকে **সুপ্রাস্পাইনাস** (supraspinous) ও **ইনফ্রাস্পাইনাস** (infraspinous) ফসা (fossa)-য় বিভক্ত করে।

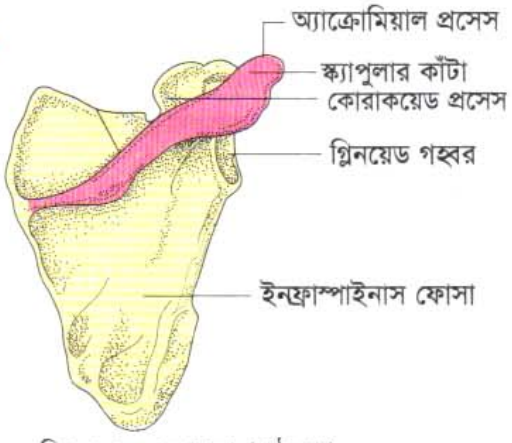

চিত্র ৭.৭ : স্ক্যাপুলা (পৃষ্ঠদৃশ্য)

খ. বাহুর অস্থি (Bones of Upperlimb)

বাহুকে ৩টি অঞ্চলে ভাগ করা যায়, যথা **উর্ধ্ববাহু, সম্মুখবাহু** এবং **হাতের অস্থি**।

১. ঊর্ধ্ববাহুর অস্থি বা হিউমেরাস (Humerus) : ঊর্ধ্ববাহু হিউমেরাস নামে একটি লম্বা, নলাকার হাড়ে গঠিত। এর ঊর্ধ্বপ্রান্তে রয়েছে মসৃণ, গোল **মস্তক** যা স্ক্যাপুলার গ্লেনয়েড গহ্বরে প্রবিষ্ট থাকে। তা ছাড়াও আছে ছোট ও বড় **টিউবার্কল** এবং এর মাঝখানে **অ্যানাটমিকাল গ্রীবা** (anatomical neck) নামে একটি খাঁজ।

টিউবার্কলের নিচে যে সরু অংশ থেকে হিউমেরাসের মূল **দেহ** গঠিত হয় তাকে **সার্জিকাল গ্রীবা** (surgical neck) বলে (কারণ, দুর্ঘটনায় এ অংশেই সচরাচর ফাটল ধরে)। মূল দেহের মধ্যভাগে পেশি সংযুক্তির জন্য খসখসে **ডেলটয়েড রিজ** (deltoid ridge) রয়েছে। দেহের কিনারা নিম্নপ্রান্তে এসে **এপিকন্ডাইল** (epicondyle) গঠন করে। এপিকন্ডাইলের নিচে **কন্ডাইল** (condyle) থাকে যা **ক্যাপিচুলাম** (capitulum) ও **ট্রকলিয়া** (trochlea)-য় বিভক্ত।

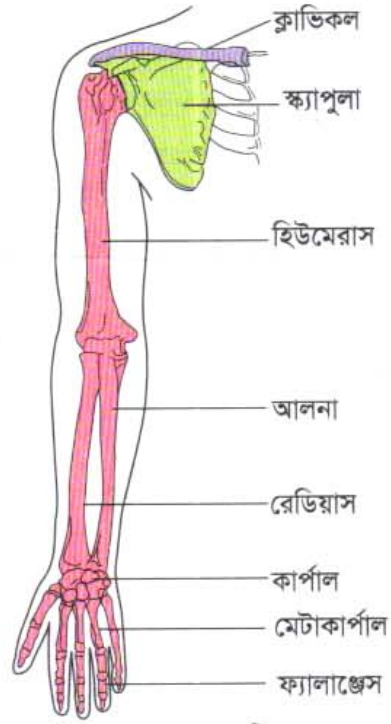

চিত্র ৭.৮ : বাহুর অস্থিসমূহ

২. সম্মুখবাহুর অস্থি বা রেডিয়াস-আলনা (Radius–Ulna) : সম্মুখবাহু দুটি লম্বা, নলাকার ও ঘনসংলগ্ন অস্থি নিয়ে গঠিত, যথা–**আলনা** ও **রেডিয়াস**। অন্তর্ভাগের অস্থিটি আলনা। এর ঊর্ধ্বপ্রান্তে **করনয়েড প্রসেস** ও **ওলেক্রেনন প্রসেস**, একটি **ট্রকলিয়ার নচ** ও একটি **টিউবারোসিটি** (অর্বুদ) অবস্থিত। নিম্নপ্রান্ত **মাথা** ও **স্টাইলয়েড প্রসেস**-এ বিভক্ত। রেডিয়াসের ঊর্ধ্বপ্রান্তে রয়েছে একটি খাঁজসহ মাথা, গ্রীবা ও অর্বুদ এবং নিম্নপ্রান্তে কার্পাল অস্থির সংযোগী তল ও একটি স্টাইলয়েড প্রসেস। ঊর্ধ্বপ্রান্তে রেডিয়াস ও আলনা অ্যানুলার পেশিতে এবং বাকি অংশ অ্যান্ট্রাকিয়াল ঝিল্লি দিয়ে যুক্ত থাকে।

৩. হাতের অস্থি : কব্জি, করতল ও আঙ্গুল নিয়ে হাত গঠিত।

কব্জি : দুসারিতে ৪টি করে মোট ৮টি ছোট ছোট বিভিন্ন আকৃতির **কার্পাল** (carpal) অস্থিতে **কব্জি** গঠিত। গোড়ার দিকের সারিতে থাকে স্ক্যাফয়েড (নেভিকুলার), লুনেট, ট্রাইকুয়েট্রাল ও পিসিফর্ম অস্থি, এবং প্রান্তের দিকে থাকে ট্র্যাপেজিয়াম, ট্র্যাপেজয়েড, ক্যাপিটেট ও হ্যামেট অস্থি।

করতল : করতলের ৫টি অস্থিকে **মেটাকার্পাল** (metacarpal) বলে। এগুলো লম্বা ও নলাকার এবং একটি গোড়া, শ্যাফট ও মাথা নিয়ে গঠিত।

আঙ্গুল : আঙ্গুলের অস্থিগুলোকে **ফ্যালাঞ্জেস** (phalanges; একবচনে phalanx) বলে। এগুলো খাটো ও নলাকার। বৃদ্ধাঙ্গুলে ২টি এবং অন্য আঙ্গুলগুলোতে ৩টি করে ফ্যালাঞ্জেস থাকে।

নিম্নাঙ্গের অস্থিসমূহ

শ্রোণি–অস্থিচক্র ও **দু'পা** নিয়ে নিম্নাঙ্গ গঠিত। দেহের উভয় পাশের ৩১টি করে মোট ৬২টি অস্থি নিম্নাঙ্গের অন্তর্গত। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. শ্রোণি-অস্থিচক্র (Pelvic Girdle)

এটি **ইলিয়াম** (ilium), **ইশ্চিয়াম** (ischium) ও **পিউবিস** (pubis) অস্থি নিয়ে গঠিত। প্রাপ্ত বয়স্ক মানবে এ অস্থিগুলো একত্রিত হয়ে **নিতম্বাস্থি** (hip bone) গঠন করে। দুটি নিতম্বাস্থি একত্রে মিলে গঠিত হয় শ্রোণি-অস্থিচক্র।

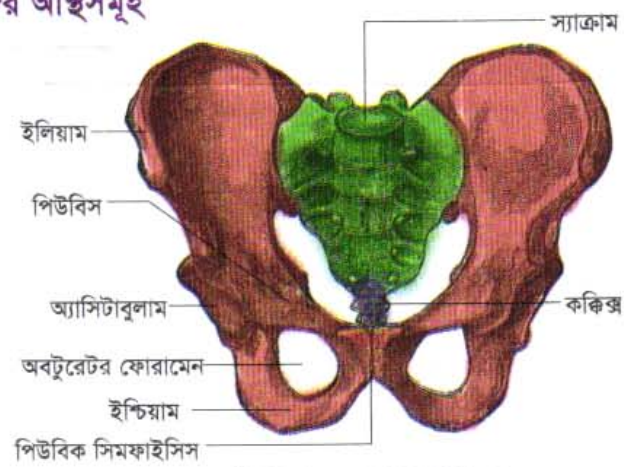

চিত্র ৭.৯ : শ্রোণি-অস্থিচক্র

❐ **ইলিয়ামটি** দেহ ও ডানায় বিভক্ত। ডানার কিনারাকে ইলিয়াক ঝুঁটি (ক্রেস্ট) বলে। কিনারা দুটি উঁচু অংশে সমাপ্ত হয়েছে, এদের সম্মুখ সুপিরিয়র ও পশ্চাৎ সুপিরিয়র কাঁটা বলে। এদের নিচে থাকে সম্মুখ ইনফিরিয়র ও পশ্চাৎ ইনফিরিয়র কাঁটা। তা ছাড়াও ইলিয়ামে আর্কুয়েট রেখা, ইলিয়াক ফসা, গ্লুটিয়াল রেখা ও একটি অরিকুলার সংযোগী তল থাকে।

❐ **পিউবিসটি** দেহ ও দুটি শাখায় বিভক্ত। শাখা দুটিকে উর্ধ্ব ও নিম্ন র‍্যামি (একবচনে–র‍্যামাস) বলে। উর্ধ্ব র‍্যামাসে একটি পিউবিক অর্বুদ (টিউবারোসিটি) এবং একটি পিউবিক ঝুঁটি থাকে।

❐ **ইশ্চিয়ামটি** দেহ, উর্ধ্ব ও নিম্ন র‍্যামি, ইশ্চিয়াল অর্বুদ এবং ইশ্চিয়াল কাঁটা নিয়ে গঠিত। কাঁটাটি বড় ইশ্চিয়াল খাঁজকে ছোটটি থেকে পৃথক করেছে। পিউবিক ও ইশ্চিয়াল র‍্যামি অবটুরেটর ছিদ্রকে বেষ্টন করে রাখে। ছিদ্রটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে যোজক টিস্যুর ঝিল্লিতে আবৃত। ইলিয়াম, ইশ্চিয়াম ও পিউবিসের সংযোগস্থলে **অ্যাসিটাবুলাম** (acetabulum) নামে একটি অগভীর অংশ রয়েছে। এতে ফিমারের মস্তক আটকানো থাকে।

শ্রোণি-অস্থিচক্রের কাজ : বস্তিকোটর, মূত্রাশয়, অন্ত্রের নিম্নাংশ প্রভৃতি অঙ্গে অবলম্বন দান করা, ভার বহন করা এবং সুরক্ষা করা শ্রোণিচক্রের কাজ। ফিমারের মস্তক অ্যাসিটাবুলাম-এ যুক্ত থাকে।

Ilium ও Ileum এর মধ্যে পার্থক্য

Ilium	Ileum
১. মেরুদণ্ডী প্রাণিদের শ্রোণিচক্রের একটি বিশেষ অস্থি।	১. সকল মেরুদণ্ডী ও কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণিদের পৌষ্টিকনালির ক্ষুদ্রান্ত্রের একটি অংশ।
২. ডানার মতো আকার।	২. সরু নালি বিশেষ।
৩. অস্থি নির্মিত।	৩. বিভিন্ন পেশিস্তরে গঠিত।
৪. ফিমারকে মেরুদণ্ডের সাথে যুক্ত রাখে।	৪. খাদ্য পরিপাক ও শোষণে সাহায্য করে।

পুরুষ ও মহিলার শ্রোণিচক্রের পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	পুরুষের শ্রোণিচক্র	মহিলার শ্রোণিচক্র
১. অস্থির গঠন	ভারী এবং আকারে বড়।	হালকা ও আকারে ছোট।
২. পেলভিসের ছিদ্র	অপেক্ষাকৃত ছোট।	অধিকতর বড়।
৩. স্যাক্রাম	সরু।	খাটো, প্রশস্ত ও চ্যাপ্টা।
৪. পিউবিক সিমফাইসিস	অগভীর।	গভীরতর।
৫. অ্যাসিটাবুলাম	বড়, পার্শ্ব অভিমুখী।	ছোট, সম্মুখ অভিমুখী।

খ. পা–এর অস্থি (Bones of Lowerlimb)

মানুষের পা **উর্ধ্ব পা, নিম্ন পা ও চরণ** নিয়ে গঠিত।

১. উর্ধ্ব পা-এর অস্থি বা ফিমার (Femur) : উর্ধ্ব পা-এর অস্থিকে **ফিমার** বলে। এটি **মানবদেহের সবচেয়ে দীর্ঘ অস্থি**। এর উর্ধ্বপ্রান্তে একটি গোল মস্তক, গ্রীবা এবং ছোট ও বড় **ট্রোক্যান্টার** অবস্থিত। দেহটি শক্ত ও নলাকার। এর পশ্চাৎতল একটি অমসৃণ আলযুক্ত। নিম্নপ্রান্ত দুটি কন্ডাইলবিশিষ্ট। দুই কন্ডাইলের মাঝখানে থাকে আন্তঃকন্ডাইলার ছিদ্র, প্যাটেলার সংযোগী তল এবং দুপাশে একটি করে **এপিকন্ডাইল** নামে সামান্য উঁচু জায়গা।

ফিমারের প্রান্তে **প্যাটেলা** (patella) নামে একটি প্রায় ত্রিকোণাকার অস্থি অবস্থিত। প্যাটেলা একটি সিসামায়েড অস্থি (sesamoid bone), কারণ এর উৎপত্তি পেশির টেনডন থেকে। প্যাটেলার পশ্চাৎভাগের উর্ধ্বাংশ ফিমারের সাথে এবং নিম্নাংশ টিবিয়ার সাথে সংযুক্ত।

২. নিম্ন পা-এর অস্থি বা টিবিয়া-ফিবুলা (Tibia-fibula): নিম্ন পা-এ দুটি অস্থি থাকে, যথা–**টিবিয়া** ও **ফিবুলা**। টিবিয়া বেশি মোটা। এর উর্ধ্বপ্রান্ত দুটি কন্ডাইল, একটি আন্তঃকন্ডাইলার স্ফীতি, ফিমারের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য দুটি সংযোগী তল এবং পেশি সংযোজনের জন্য একটি **টিউবারোসিটি** বহন করে। টিবিয়ার দেহ ত্রিধারবিশিষ্ট। এর

সম্মুখ কিনারা **ঝুঁটি** নামে পরিচিত। টিবিয়ার নিম্নপ্রান্তে **ম্যালিওলাস** নামে দুপাশে উঁচু অংশ থাকে। এতে ট্যালাস (টার্সাল অস্থি)-এর সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সংযোগী তলও রয়েছে।

ফিবুলা দেখতে একটি দীর্ঘ যষ্টির মতো। এর মস্তক চোখা ধরনের। উর্ধ্বপ্রান্তে টিবিয়ার সংযোগের জন্য একটি সংযোগী তল থাকে। নিচের প্রান্তে থাকে ম্যালিওলাস।

৩. চরণ : গোড়ালি, পদতল ও আঙ্গুল নিয়ে চরণ গঠিত।

গোড়ালি ও পদতলের পৃষ্ঠভাগ গঠিত হয় ৭টি বিভিন্ন আকৃতির **টার্সাল** (tarsal) অস্থি দিয়ে [একটি করে ক্যালকেনিয়াস, ট্যালাস, কিউবয়েড, নেভিকুলার ও ৩টি কুনিফর্ম]। মেটাটার্সাল–এর সংখ্যা ৫। এগুলো নলাকার ও সামান্য লম্বা এবং পদতল গঠন করে। পায়ের আঙ্গুলের অস্থিগুলো **ফ্যালাঞ্জেস** (phalanges)। এগুলো হাতের আঙ্গুল অপেক্ষা খাটো। বৃদ্ধাঙ্গুল ২টি এবং বাকি আঙ্গুলগুলো ৩টি করে ফ্যালাঞ্জেসে গঠিত। পা-এর অস্থিগুলো পরস্পরের সাথে সন্ধির মাধ্যমে যুক্ত। এদের ভিতর নিতম্ব সন্ধি, হাঁটু সন্ধি ও গোড়ালি সন্ধি সবচেয়ে বড়।

পায়ের কাজ : পা দুটি প্রত্যক্ষভাবে ভারবহন করে ও গমনের সাথে জড়িত।

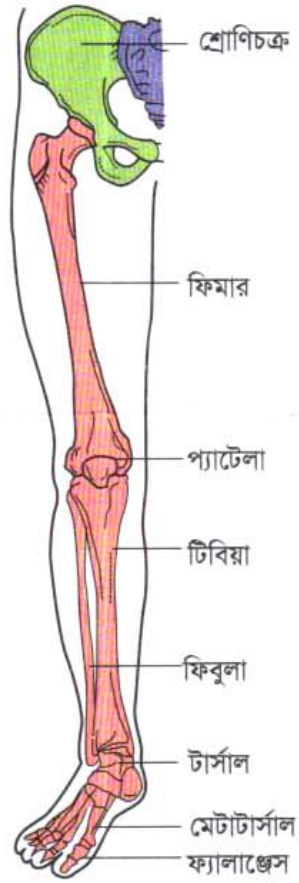

চিত্র ৭.১০ : মানুষের পায়ের অস্থি

অস্থি ও তরুণাস্থি (Bone and Cartilage)

অস্থি ও **তরুণাস্থি** হচ্ছে বিশেষ ধরনের যোজক টিস্যু যাদের মাতৃকা (matrix) কঠিন বা অর্ধকঠিন পদার্থে তৈরি। এদের **কঙ্কাল যোজক টিস্যু** বলে।

অস্থি (Bone)

গঠন : অস্থি হচ্ছে দেহের সবচেয়ে সুদৃঢ় টিস্যু। এর মাতৃকা বা ম্যাট্রিক্স বিভিন্ন জৈব (৪০%) ও অজৈব (৬০%) পদার্থে গঠিত হওয়ায় সম্পূর্ণ টিস্যুটি কঠিন আকার ধারণ করে। জৈব অংশটি **কোলাজেন** (collagen) ও **অসিমিউকয়েড** (osimucoid)-এ গঠিত। অজৈব অংশটিতে প্রধানত ক্যালসিয়াম ফসফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বোনেট রয়েছে। মাতৃকায় প্রধানত তিন ধরনের অস্থিকোষ থাকে– **অস্টিওব্লাস্ট** (osteoblast), **অস্টিওক্লাস্ট** (osteoclast) এবং **অস্টিওসাইট** (osteocytes)। **পেরিঅস্টিয়াম**

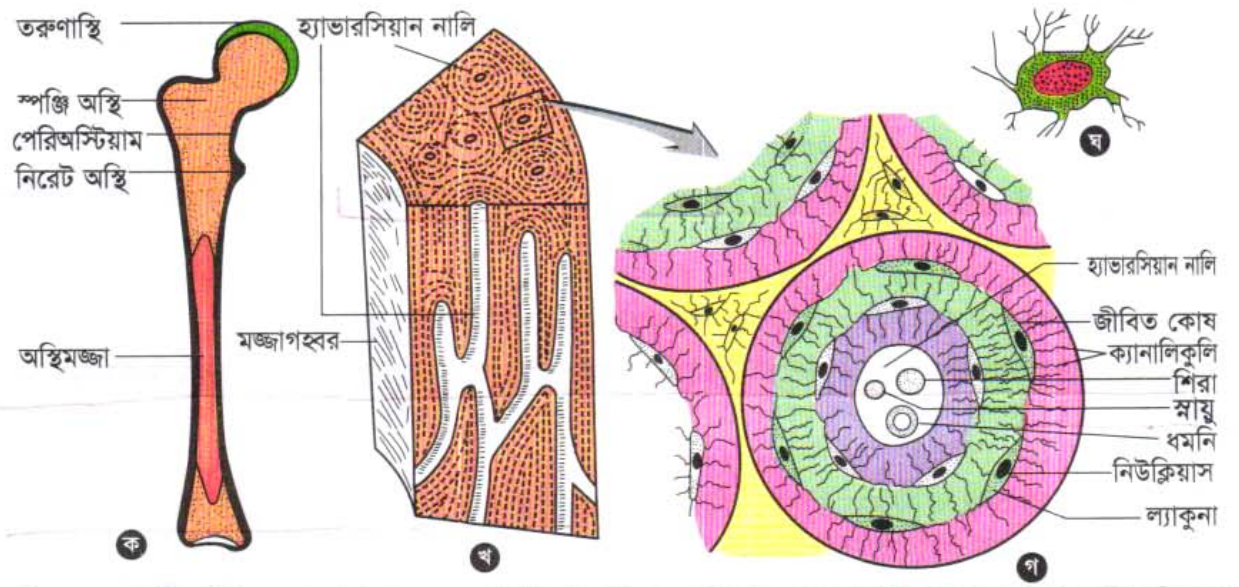

চিত্র ৭.১১ :অস্থির বিভিন্ন অংশ; (ক) লম্বচ্ছেদ; (খ) নিরেট অস্থির অংশবিশেষ; (গ) হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র; (ঘ) একটি অস্থিকোষ

(periosteum) নামক তন্তুময় যোজক টিস্যু নির্মিত পাতলা ও মসৃণ আবরণ প্রতিটি অস্থিকে ঘিরে রাখে। অস্থিতে প্রচুর রক্ত সরবরাহ বিদ্যমান। এ টিস্যু মেরুদন্ডী প্রাণীর দৈহিক কাঠামো নির্মাণ করে।

অস্থির প্রকারভেদ : উপাদানের ঘনত্ব, দৃঢ়তা ও গঠনের ভিত্তিতে অস্থিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়: যেমন–**নিরেট অস্থি** (compact bone) এবং **স্পঞ্জি অস্থি** (spongy bone)। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. নিরেট অস্থি (Compact bone) : নিরেট অস্থির ম্যাট্রিক্স কতকগুলো স্তরে (৫-১৫টি) সাজানো। স্তরগুলোকে **ল্যামেলি** (lamellae) বলে। ল্যামেলি একটি সুস্পষ্ট নালির চারদিকে চক্রাকারে বিন্যস্ত। কেন্দ্রীয় এ নালিটি হচ্ছে **হ্যাভারসিয়ান নালি** (haversian canal)। প্রতিটি হ্যাভারসিয়ান নালি ও একে বেষ্টনকারী ল্যামেলির সমন্বয়ে একটি **হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র** (haversian system) গড়ে উঠে। প্রত্যেক ল্যামেলায় (একবচন) **ল্যাকুনা** (lacuna) নামে কতকগুলো ক্ষুদ্র গহ্বর পাওয়া যায়। অস্থিকোষ ল্যাকুনার ভিতরে অবস্থান করে। প্রতিটি ল্যাকুনার চারদিক থেকে সূক্ষ্ম কতকগুলো নালিকা বেরোয়। এদের **ক্যানালিকুলি** (canaliculi) বলে। এসব নালিকার মাধ্যমে একটি হ্যাভারসিয়ান তন্ত্রের বিভিন্ন ল্যাকুনা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। অস্থির অভ্যন্তরে হ্যাভারসিয়ান নালিগুলো পরস্পরের আড়াআড়ি নালি দিয়ে যুক্ত থাকে। এসব নালিকে বলে **ভকম্যানস ক্যানাল** (Volkmann's canal)। হ্যাভারসিয়ান তন্ত্রসমূহের অন্তর্বর্তীস্থানে কঠিন ম্যাট্রিক্স ও অস্টিওসাইট উপস্থিত থেকে অস্থি সুদৃঢ় করে। অস্থির কেন্দ্রস্থলে যে গহ্বর থাকে তার নাম **মজ্জা গহ্বর**। গহ্বরটি **লাল** বা **হলুদ মজ্জা** (red or yellow bone marrow)–য় পূর্ণ থাকে। ফিমার ও হিউমেরাস এ ধরনের অস্থি।

২. স্পঞ্জি অস্থি (Spongy bone) : নিরেট অস্থির অভ্যন্তরে বিদ্যমান স্পঞ্জি অস্থি অপেক্ষাকৃত হালকা, অসংখ্য কুঠুরিযুক্ত স্পঞ্জের মতো। এসব অস্থির গঠন স্পঞ্জ বা মৌচাকের মতো বলে এদেরকে **ক্যানসেলাস** (cancellous) বা **ট্রাবেকুলার** (trabecular) **অস্থি** বলা হয়। মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রের মোট ওজনের প্রায় ২০% স্পঞ্জি অস্থি। স্পঞ্জি অস্থির গাঠনিক ও কার্যকরি একককে **ট্রাবেকুলা** (trabecula) বলে যা ল্যামিলি, অস্টিওসাইট, ল্যাকুনি ও ক্যানালিকুলির সমন্বয়ে গঠিত। ট্রাবেকুলাসমূহের মধ্যবর্তী স্থান লোহিত অস্থিমজ্জা দ্বারা পূর্ণ থাকে। অস্থি আবরণ **পেরিঅস্টিয়াম** থেকে রক্তনালিকা ট্রাবেকুলাতে প্রবেশ করে অস্থির কোষমূহকে পুষ্টি সরবরাহ করে। স্পঞ্জি অস্থিতে ক্যালসিয়াম লবণের পরিমাণ কম থাকে। এতে হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র থাকে না। স্তন্যপায়ীদের করোটিকা, চ্যাপ্টা হাড়, বৃহৎ অস্থির প্রান্তভাগ এবং পাখিদের সকল অস্থি স্পঞ্জি ধরনের। **শিশুদের প্রায় সকল অস্থিই স্পঞ্জি প্রকৃতির।**

নিরেট অস্থি ও স্পঞ্জি অস্থির মধ্যে পার্থক্য

নিরেট অস্থি	স্পঞ্জি অস্থি
১. এদের কর্টিকেল অস্থি বলা হয়।	১. এদের ট্রাবেকুলার অস্থি বলা হয়।
২. হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র নামক এককে গঠিত।	২. ট্রাবেকুলা নামক এককে গঠিত।
৩. ঘন, ভারী ও মজবুত ধরনের।	৩. পাতলা ও হালকা ধরনের।
৪. এটি অস্থির বাইরের প্রধান স্তর গঠন করে।	৪. এটি নিরেট অস্থির ভিতরে অবস্থান করে।
৫. মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রের মোট ওজনের প্রায় ৮০% নিরেট অস্থি।	৫. মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রের মোট ওজনের প্রায় ২০% স্পঞ্জি অস্থি।

অস্থির কাজ : অস্থি মানবদেহের নিচে বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করে।

১. অস্থি দেহের দৃঢ় ও মজবুত স্থাপত্য কাঠামো গঠন করে এবং দেহকে নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতি প্রদান করে।
২. দেহের গুরুত্বপূর্ণ (অঙ্গাদি যেমন-মস্তিষ্ক, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, সুষুম্নাকাণ্ড প্রভৃতি) অস্থি নির্মিত কঙ্কাল দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।
৩. দেহের অধিকাংশ পেশি, লিগামেন্ট ও টেনডন অস্থিতে সংযুক্ত থেকে বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটায়।
৪. অস্থিসন্ধি গঠন এবং পেশির সাথে সমন্বয় দ্বারা অস্থি নির্মিত কাঙ্কালতন্ত্র প্রাণীর চলনে প্রধান ভূমিকা রাখে।
৫. অস্থির ভিতরে অবস্থিত লোহিত অস্থিমজ্জা (red bone marrow) থেকে প্রতিনিয়ত লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি হয়। পীত অস্থিমজ্জা (yellow bone marrow) সঞ্চিত চর্বির আধার হিসেবে কাজ করে।
৬. ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস জাতীয় খনিজ লবণ অস্থিতে সঞ্চিত হয়।
৭. কঙ্কালতন্ত্রের সবচেয়ে ছোট অস্থি অন্তঃকর্ণের মেলিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস শ্রবণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।

তরুণাস্থি বা কোমলাস্থি (Cartilage)

তরুণাস্থির ম্যাট্রিক্স বা মাতৃকা **কনড্রিন** (chondrin) নামে একধরনের অর্ধ-কঠিন ও স্থিতিস্থাপক পদার্থে গঠিত। কনড্রিন **কনড্রোমিউকয়েড** (chondromucoid) ও **কনড্রোঅ্যালবুনয়েড** (chondroalbunoid) নামক দুধরনের প্রোটিনে গঠিত। তরুণাস্থিকোষকে **কনড্রোসাইট** (chondrocyte) বলে। ম্যাট্রিক্সে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু গহ্বর দেখা যায়। প্রত্যেকটি গহ্বর **ল্যাকুনা** (lacuna) নামে পরিচিত। প্রতিটি ল্যাকুনা এক বা একাধিক **কনড্রোসাইট** বহন করে। ল্যাকুনাগুলো তরলে পূর্ণ থাকে। **পেরিকন্ড্রিয়াম** (perichondrium) নামক রক্তনালি সমৃদ্ধ তন্তুময় আবরণীতে তরুণাস্থি আবৃত থাকে। আবরণী ও মাতৃকা ভেদ্য বলে তরুণাস্থি টিস্যুতে রক্তনালি প্রয়োজন হয়না। রক্তের বস্তুসমূহ ব্যাপনের (diffusion) মাধ্যমে কোষে প্রবেশে সক্ষম।

কাজ : (i) ম্যাট্রিক্সের বৈশিষ্ট্যের জন্য অন্যান্য টিস্যু অপেক্ষা অনেক বেশি চাপ ও টান (tension) সহ্য করতে পারে। (ii) বিভিন্ন অঙ্গের আকৃতি দান করে। (iii) অস্থিসন্ধিতে অবস্থান করে অস্থির প্রান্তভাগকে ঘর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করে। (iv) মেরুদন্ডী প্রাণিদের ভ্রূণীয় কঙ্কাল ও কন্ড্রিকথিস জাতীয় মাছের অন্তঃকঙ্কাল গঠন করে।

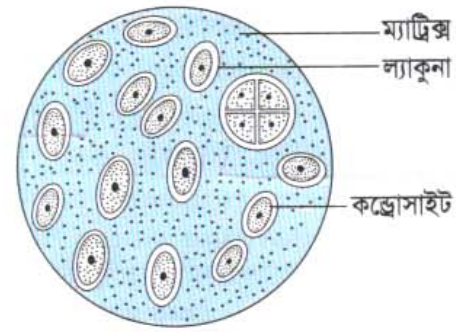

চিত্র ৭.১২ : স্বচ্ছ তরুণাস্থি

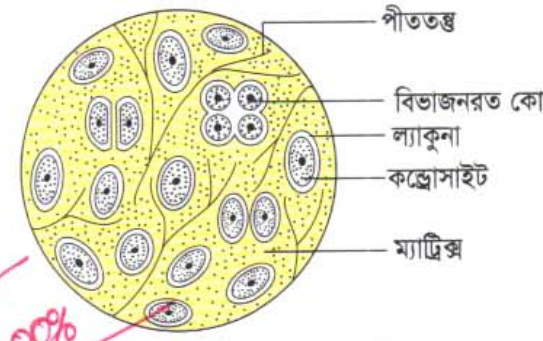

চিত্র ৭.১৩ : স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি

তরুণাস্থির প্রকারভেদ

ম্যাট্রিক্সের গঠনের উপর ভিত্তি করে নিচে বর্ণিত চার ধরনের তরুণাস্থি পাওয়া যায় :

১. স্বচ্ছ বা হায়ালিন (Hyaline) **তরুণাস্থি :** এর ম্যাট্রিক্স সামান্য স্বচ্ছ, নীলাভ, নমনীয় এবং তন্তুবিহীন। স্তন্যপায়ীর নাক, শ্বাসনালি, স্বরযন্ত্র প্রভৃতি স্থানে এবং ব্যাঙ ও হাঙরের ভ্রূণে বা পরিণত দেহে প্রচুর পরিমাণে এ ধরনের তরুণাস্থি পাওয়া যায়।

২. স্থিতিস্থাপক (Elastic) বা **পীত-তন্তুময় তরুণাস্থি :** এর ম্যাট্রিক্স অস্বচ্ছ ও হাল্কা হলুদ বর্ণের। ম্যাট্রিক্সে স্থিতিস্থাপক পীততন্তু ছড়ানো থাকে। বাইরের দিকের তুলনায় ভিতরের তন্তুগুলো অপেক্ষাকৃত ঘনবিন্যস্ত। বহিঃকর্ণ বা **পিনা**, ইউস্টেশিয়ান নালি, এপিগ্লটিস প্রভৃতি অংশে এ ধরনের তরুণাস্থি পাওয়া যায়।

৩. শ্বেত-তন্তুময় (White fibrous) **তরুণাস্থি :** এর ম্যাট্রিক্সে প্রচুর পরিমাণ সাদা বর্ণের, অশাখ, অস্থিতিস্থাপক, **কোলাজেন** নির্মিত তন্তু সমান্তরালে বিন্যস্ত থাকে। বিশেষ কয়েকটি সন্ধিতে, যেমন–দুটি কশেরুকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে এ ধরনের তরুণাস্থি পাওয়া যায়।

৪. চুনময় বা ক্যালসিফাইড (Calcified) **তরুণাস্থি :** এ ক্ষেত্রে ম্যাট্রিক্সে প্রচুর ক্যালসিয়াম কার্বোনেট জমা থাকে, ফলে অনেকটা অস্থির মতো শক্ত রূপ ধারণ করে। হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তকে এ ধরনের তরুণাস্থি পাওয়া যায়।

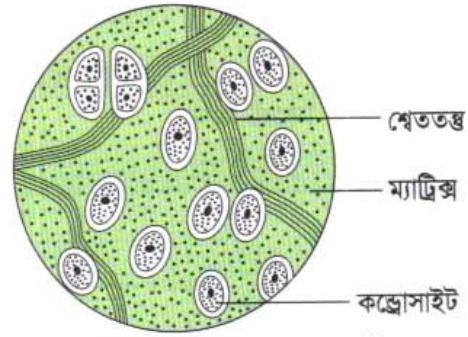

চিত্র ৭.১৪ : শ্বেত-তন্তুময় তরুণাস্থি

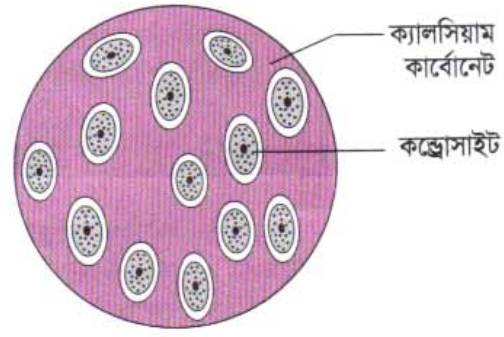

চিত্র ৭.১৫ : ক্যালসিফাইড তরুণাস্থি

Full page 100

তরুণাস্থি ও অস্থির মধ্যে পার্থক্য		
তুলনীয় বৈশিষ্ট্য	তরুণাস্থি (কোমলাস্থি)	অস্থি
১. অবস্থান	অস্থির সংযোগস্থলে, পর্শুকার শেষপ্রান্তে, নাসিকা, কর্ণছত্র, স্বরযন্ত্র প্রভৃতি স্থানে।	দেহের অন্তঃকঙ্কালরূপে।
২. গঠন	অকঠিন, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক এবং বিভিন্ন তন্তু ও কোষ নিয়ে গঠিত।	কঠিন, অনমনীয়, অস্থিতিস্থাপক এবং বিভিন্ন ধরনের অস্থিকোষ নিয়ে গঠিত।
৩. ম্যাট্রিক্স (মাতৃকা)	ম্যাট্রিক্সে **কন্ড্রিন** নামক জৈব পদার্থ থাকে।	ম্যাটিক্সে জৈব পদার্থের মধ্যে কোলাজেন তন্তু, মিউকোপলি স্যাকারাইড এবং অজৈব পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ইত্যাদি থাকে।
৪. কোষের গঠন	গোলাকার বা ডিম্বাকার।	মাকড়সার জালের মত।
৫. আবরণ	পেরিকন্ড্রিয়াম আবরণ দিয়ে আবৃত।	পেরিঅস্টিয়াম আবরণ দিয়ে আবৃত।
৬. হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র	থাকে না।	উপস্থিত।
৭. কাজ	দেহের আকৃতি ও ঋজুতা দান; অস্থি গঠন; এবং অস্থির সংযোজক অংশকে দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক করায় সহায়তা দান।	দেহের কাঠামো গঠন; নির্দিষ্ট আকৃতি দান; ভারবহন; দেহযন্ত্রের সুরক্ষা; এবং রক্তকণিকা উৎপাদনে সহায়তা দান।

ব্যবহারিক অংশ

মানুষের বিভিন্ন অস্থি পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ

মানুষের করোটি (Skull)

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. করোটিকার অস্থি, মুখমন্ডলের অস্থি,কর্ণাস্থি ও হাইওয়েড অস্থির সমন্বয়ে করোটি গঠিত।

২. চোয়াল ও ইন্দ্রিয়কোটর (নাক, কান, চোখ) বিদ্যমান।

৩. করোটির পেছনে ও নিচে একটি বড় ছিদ্রপথ বা **মহাবিবর** (foramen magnum) বিদ্যমান।

৪. করোটিকার অস্থিগুলো হচ্ছে– ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল, অক্সিপিটাল, টেম্পোরাল, স্ফেনয়েড ও এথময়েড।

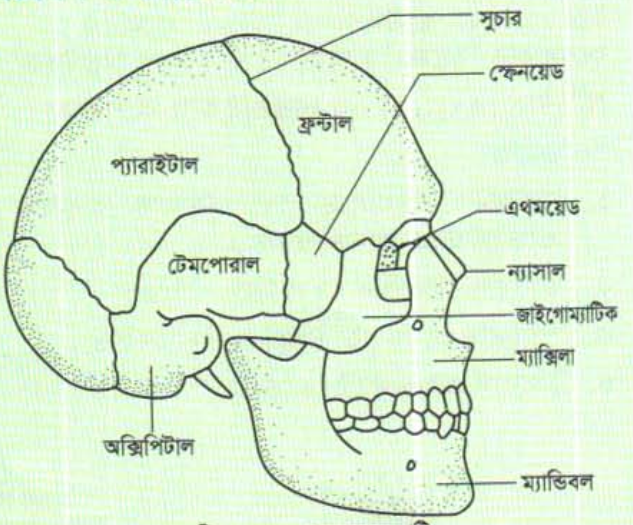

চিত্র ৭.১৬ : মানুষের করোটি

মানুষের ম্যান্ডিবল (নিম্নচোয়াল)

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. করোটির নিম্নচোয়াল গঠনকারী সর্ববৃহৎ, মজবুত ও অযুগ্ম অস্থি।

২. এটি একটি "U" আকৃতির **মূলদেহ** এবং দুটি চওড়া **র‍্যামি** (বহুবচন–rami; একবচন–ramus) নিয়ে গঠিত।

৩. মূলদেহ **বেস** ও **অ্যালভিওলার প্রসেস** নিয়ে গঠিত; অ্যালভিওলার প্রসেসে দাঁতের গোড়া প্রোথিত থাকে।

৪. প্রতিটি র‍্যামাস হাতলের মতো অংশ; এতে **করোনয়েড** ও **কন্ডাইলয়েড** নামক দুটি প্রবর্ধন এবং একটি ম্যান্ডিবুলার ছিদ্র থাকে।

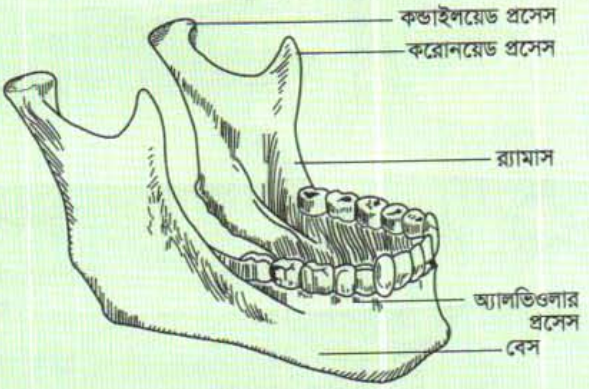

চিত্র ৭.১৭ : মানুষের ম্যান্ডিবল

হাইওয়েড (Hyoid) অস্থি

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. এটি একটি "U" আকৃতির অস্থি।
২. অস্থির মাঝখানের অংশটির নাম **হাইওয়েড বডি**।
৩. বডি থেকে দুই জোড়া কাঁটা বা **কর্নুয়া** (cornua) বিস্তৃত।
৪. একজোড়া কর্নুয়া ছোট, এরা পার্শ্বীয়ভাবে অবস্থান করে।
৫. অন্যজোড়া কর্নুয়া বড় এবং পশ্চাৎদিকে অবস্থান করে।

চিত্র ৭.১৮ : হাইওয়েড অস্থি (সম্মুখদৃশ্য)

অ্যাটলাস (Atlas) বা প্রথম সারভাইকাল (গ্রীবাদেশীয়) কশেরুকা

শনাক্তকরণ

১. অস্থিটি দেখতে **আংটির মতো**।
২. সেন্ট্রাম ও স্পাইনাস প্রসেস অনুপস্থিত।
৩. **ভার্টিব্রাল ফোরামেন** (নিউরাল নালি) বেশ বড়।
৪. ট্রান্সভার্স প্রসেস বেশ বড় এবং **ধমনি ছিদ্র** (ফোরামেন) যুক্ত।
৫. একজোড়া **সুপিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট** থাকে।

[ক্ষুদ্র ১ম কশেরুকা অনেক বড় করোটিকে বহন করে। দেবতা **অ্যাটলাস**-এর কাজের সাথে ১ম কশেরুকার "কাজের" সামঞ্জস্যের জন্য একে "অ্যাটলাস" বলা হয়।]

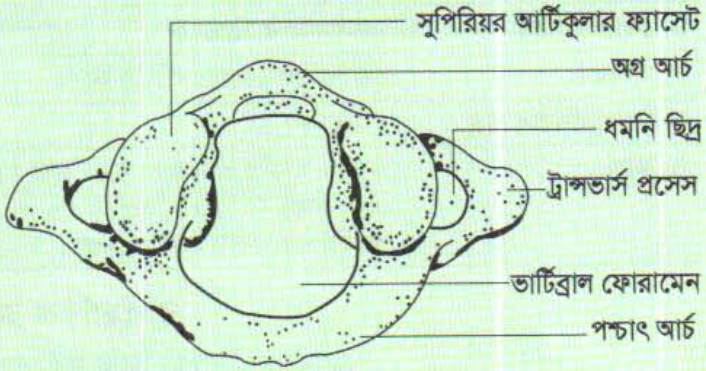

চিত্র ৭.১৯ : অ্যাটলাস

অ্যাক্সিস (Axis) বা ২য় সারভাইকাল কশেরুকা

শনাক্তকরণ

১. সেন্ট্রামের সম্মুখপ্রান্তে লম্বা কনিক্যাল আকৃতির **ওডোন্টোয়েড প্রসেস** রয়েছে।
২. ভার্টিব্রাল ফোরামেন বড় ও ত্রিকোণাকার।
৩. স্পাইনাস প্রসেস বড়, চওড়া ও শীর্ষ দ্বিখন্ডিত।
৪. ট্রান্সফার্স প্রসেস খাটো ও ভোঁতা।

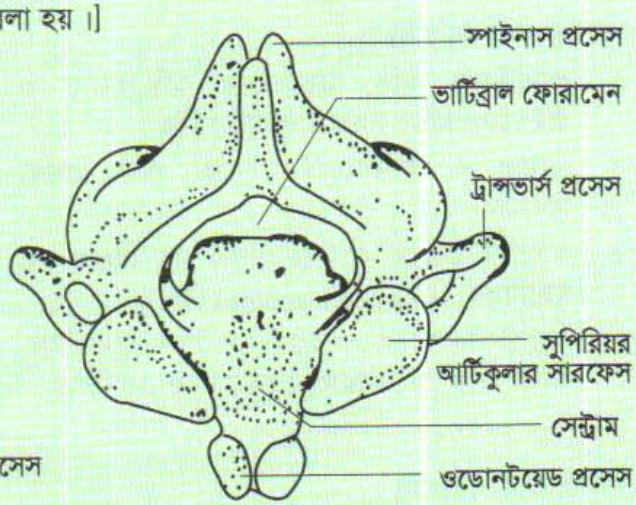

চিত্র ৭.২০ : অ্যাক্সিস

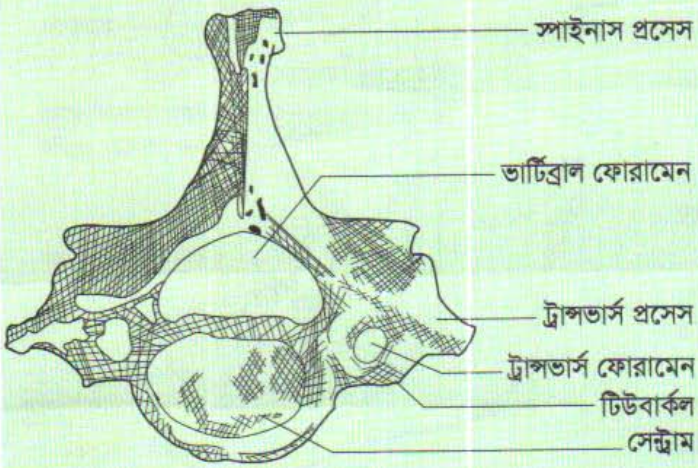

চিত্র ৭.২১ : ভার্টিব্রা প্রমিন্যান্স

ভার্টিব্রা প্রমিনেন্স (Vertebra Prominens) বা ৭ম সারভাইকাল কশেরুকা

শনাক্তকরণ

১. স্পাইনাস প্রসেস অসাধারণভাবে দীর্ঘ ও অবিভক্ত।
২. ট্রান্সভার্স প্রসেস বেশ প্রশস্ত এবং ক্ষুদ্র **ট্রান্সভার্স ফোরামেন** যুক্ত।
৩. ট্রান্সভার্স ফোরামেনের পশ্চাৎ অংশে সুস্পষ্ট **টিউবার্কল** থাকে।

থোরাসিক (বক্ষদেশীয়) কশেরুকা

শনাক্তকরণ

১. সেন্ট্রাম মাঝারী ও হৃৎপিন্ড আকৃতির।

২. ভার্টিব্রাল ফোরামেন ছোট ও গোলাকার।

৩. সেন্ট্রামের উভয় পাশে দেহ ও আর্চের সংযোগস্থলে পর্শুকার মস্তক সংযোগে **কোস্টাল ফ্যাসেট** উপস্থিত।

৪. ট্রান্সভার্স প্রসেসের প্রান্তে মসৃণ **টিউবারকুলার ফ্যাসেট** বিদ্যমান।

৫. স্পাইনাস প্রসেস লম্বা ও সরু।

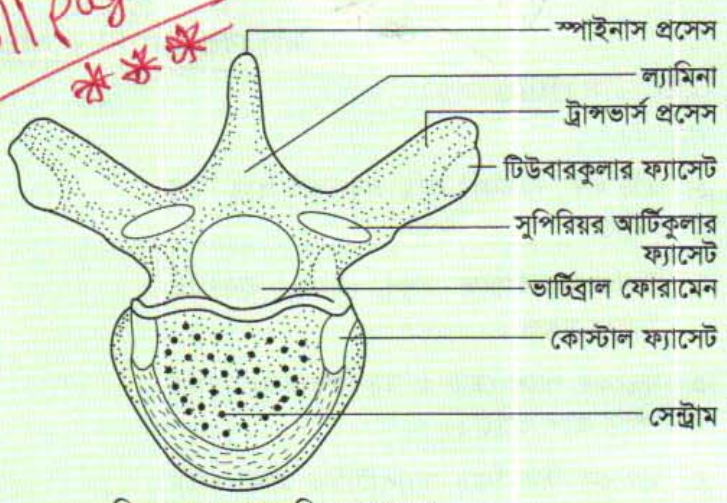

চিত্র ৭.২২ : থোরাসিক কশেরুকা

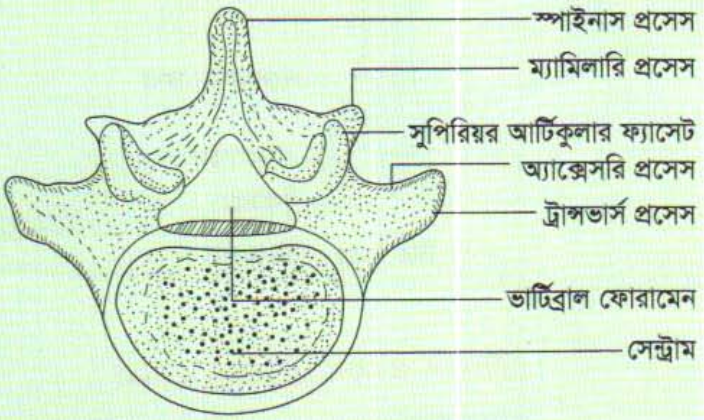

চিত্র ৭.২৩ : লাম্বার কশেরুকা

লাম্বার (কটিদেশীয়) কশেরুকা

শনাক্তকরণ

১. সেন্ট্রাম বড়, মজবুত ও বৃক্ক আকৃতির।

২. ভার্টিব্রাল ফোরামেন বড় ও ত্রিকোণাকার।

৩. ট্রান্সভার্স প্রসেস লম্বা; ট্রান্সভার্স ফোরামেন নেই।

৪. ট্রান্সভার্স প্রসেসের পশ্চাৎ তলে **ম্যামিলারি ও অ্যাক্সেসরি প্রসেস** উপস্থিত।

৫. স্পাইনাস প্রসেস খাটো, মোটা ও চতুষ্কোণা।

স্যাক্রাম (Sacrum)

শনাক্তকরণ

১. শ্রোণি অঞ্চলে মেরুদণ্ডের পাঁচটি কশেরুকা মিলিত হয়ে ত্রিকোণাকার এবং বৃহৎ **স্যাক্রাম** গঠন করে।

২. সকল ভার্টিব্রাল ফোরামেন বা নিউরাল ছিদ্র মিলিতভাবে **স্যাক্রাল নালি** গঠন করে।

৩. সকল স্পাইনাস প্রসেস মিলিত হয়ে স্যাক্রামের পৃষ্ঠদিকে **স্যাক্রাল ক্রেস্ট** গঠন করে।

৪. পঞ্চম স্যাক্রাল কশেরুকায় একটি ডিম্বাকৃতির ফ্যাসেট থাকে যার সাথে **কক্সিক্স** যুক্ত হয়।

৫. বেস বা ভিত্তির অগ্র-অঙ্কীয় ভাগে একটি **স্যাক্রাল প্রমোন্টরি** নামক প্রবর্ধন থাকে।

৬. স্যাক্রামের পৃষ্ঠ-অঙ্কীয় দেশে ৪ জোড়া **স্যাক্রাল ছিদ্র** বিদ্যমান।

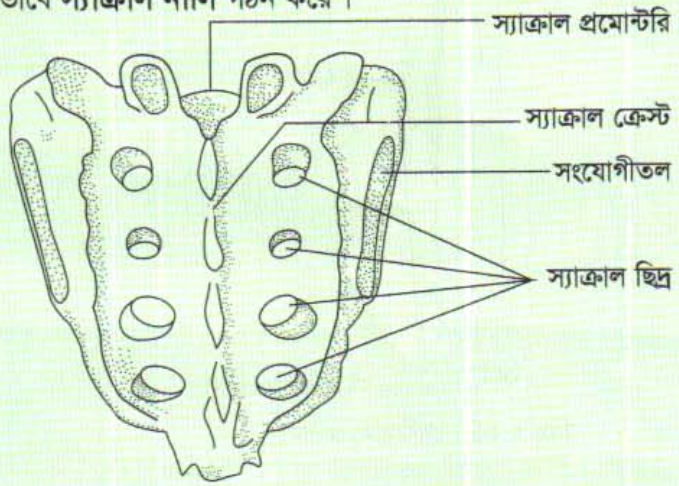

চিত্র ৭.২৪ : স্যাক্রাম

Full page ***

মানুষের অগ্রপদের অস্থি পর্যবেক্ষণ

হিউমেরাস (Humerus)

শনাক্তকরণ

১. এটি লম্বা, নলাকার অস্থি এবং দুটি প্রান্ত নিয়ে গঠিত।

২. উর্ধ্বপ্রান্তে রয়েছে মসৃণ, গোল, তরুণাস্থি নির্মিত **মস্তক**।

৩. মস্তকের পাশে ছোট ও বড় **টিউবার্কল** নামক স্ফীত অংশ আছে।

৪. মস্তকের ঠিক নিচে **অ্যানাটমিক গ্রীবা** নামে একটি খাঁজ আছে।

৫. মূলদেহের মধ্যভাগে **ডেল্টয়েড রিজ** নামক উঁচু অঞ্চল রয়েছে।

৬. নিম্নপ্রান্তে উত্তল **ক্যাপিচুলাম** এবং কপিকলের মতো **ট্রকলিয়া** বিদ্যমান।

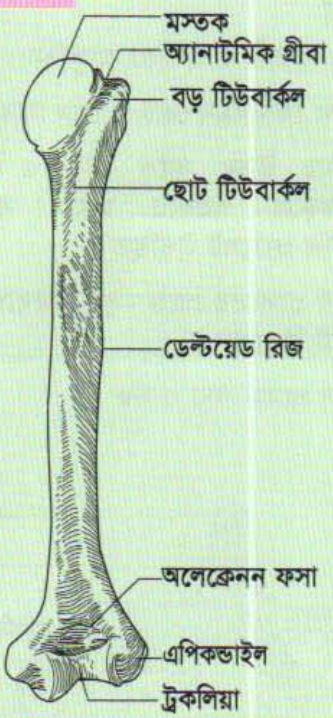

চিত্র ৭.২৫ : হিউমেরাস

চিত্র ৭.২৬ : রেডিয়াস-আলনা

রেডিয়াস-আলনা (Radius-Ulna)

শনাক্তকরণ

১. **রেডিয়াস** ও **আলনা** নামক পৃথক অথচ পরস্পরের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ দুটি অস্থি নিয়ে গঠিত।

২. রেডিয়াসের উপরে **মস্তক**-এর নিচে সংকুচিত **গ্রীবা** এবং একটু পরেই একটি উঁচু **টিউবারোসিটি** বিদ্যমান।

৩. এর নিচের অংশটি চ্যাপ্টা এবং **স্টাইলয়েড প্রসেস** নামক উঁচু অংশ আছে।

৪. আলনার উর্ধ্বপ্রান্তে অবতল **ট্রকলিয়ার নচ** পাওয়া যায়।

৩. আলনার অগ্রাংশে উঁচু **ওলেক্রেনন প্রসেস** ও **করনয়েড প্রসেস** বিদ্যমান।

বক্ষপিঞ্জর (Thoracic case)

শনাক্তকরণ

১. পর্শুকাগুলো একদিকে থোরাসিক ও অন্যদিকে স্টার্নামের সাথে যুক্ত হয়ে পিঞ্জরের মতো গঠন তৈরি করেছে।

২. এতে একটি **স্টার্নাম**, ১২ জোড়া **পর্শুকা** (Rib) এবং ১২টি **থোরাসিক কশেরুকা** থাকে।

৩. স্টার্নাম তিন অংশে বিভক্ত– **ম্যানুব্রিয়াম, দেহ ও জিফয়েড প্রসেস**।

৪. পর্শুকাগুলো লম্বা, সরু, চাপা ও বাঁকা অস্থি।

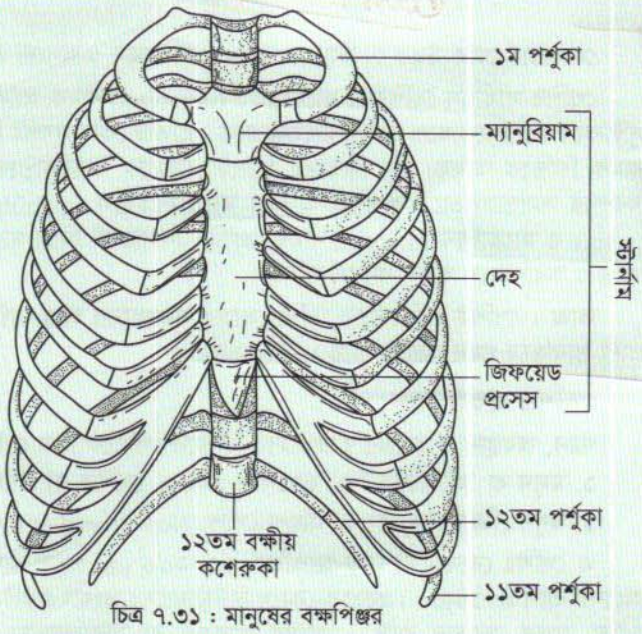

চিত্র ৭.৩১ : মানুষের বক্ষপিঞ্জর

শ্রোণি-অস্থিচক্র বা পেলভিক গার্ডেল (Pelvic girdle)

শনাক্তকরণ

১. ২টি সমান অংশের সমন্বয়ে গঠিত একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট অস্থি।

২. প্রতিটি অর্ধাংশ **ইলিয়াম, ইশ্চিয়াম** এবং **পিউবিস** এ তিনটি অস্থির সমন্বয়ে গঠিত।

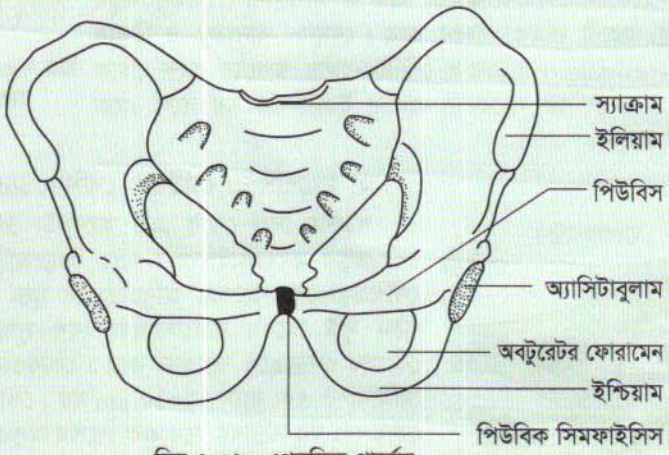

চিত্র ৭.৩২ : পেলভিক গার্ডেল

৩. ইশ্চিয়ামের উপরের দিকে একটি কাঁটা এবং নিচের দিকে **টিউবারোসিটি** বর্তমান।

৪. ইলিয়াম ও পিউবিস দিয়ে পরিবেষ্টিত একটি বড় ছিদ্র **অবটুরেটর ফোরামেন** রয়েছে।

৫. তিনটি অস্থির মিলনস্থলে একটি গভীর অবতল গহ্বর **অ্যাসিটাবুলাম** অবস্থিত।

জীব দ্বিতীয় পত্র -২৮

Full page
Class Note

পেশি টিস্যু (Muscular Tissue)

মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত যে টিস্যু সংকোচন-প্রসারণক্ষম ও অসংখ্য তন্তুর সমন্বয়ে গঠিত তাকে **পেশি** বা **পেশি টিস্যু** বলে।

পেশির সাধারণ বৈশিষ্ট্য : মায়োব্লাস্ট (myoblast) নামক আদিকোষ রূপান্তরিত হয়ে তন্তুর মতো লম্বা পেশিকোষ সৃষ্টি করে। পেশিকোষকে তাই **পেশিতন্তু** বলে। প্রতিটি কোষ সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং **সারকোলেমা** (sarcolemma) নামক ঝিল্লিতে আবৃত; এর ভিতরের সাইটোপ্লাজমকে **সারকোপ্লাজম** (sarcoplasm) বলে। সারকোপ্লাজমের মধ্যে পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থিত অসংখ্য **মায়োফাইব্রিল** (myofibril) নামক সূক্ষ্ম তন্তু থাকে। গুচ্ছবদ্ধ **অ্যাকটিন** (actin) ও **মায়োসিন** (myosin) নামক প্রোটিন ফিলামেন্ট দিয়ে মায়োফাইব্রিল গঠিত। পেশি টিস্যু প্রায় ৭৫ শতাংশ পানি ও অবশিষ্টাংশ কঠিন পদার্থে গঠিত।

কাজ : পেশিই প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালনের জন্য দায়ী। অস্থিসংলগ্ন পেশির সংকোচন-প্রসারণের ফলে প্রাণী স্থানান্তরে গমন করতে পারে।

পেশির প্রকারভেদ

গঠন, অবস্থান ও কাজের তারতম্যের ভিত্তিতে পেশিকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:
১. **মসৃণ** বা **অনৈচ্ছিক;** ২. **হৃৎপেশি** এবং ৩. **রৈখিক বা ঐচ্ছিক**।

১. মসৃণ (ভিসেরাল) বা অনৈচ্ছিক পেশি (Non-striated or Involuntary muscle)

এ পেশির কোষগুলো মাকু আকৃতির, ১৫–২০০ μm পর্যন্ত দীর্ঘ। কোষের চওড়া অংশের ব্যাস ৮–১০μm। প্রত্যেক কোষে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা একটি এবং এটি কোষের চওড়া অংশে অবস্থান করে। কোষের আবরণী বা সারকোলেমা অস্পষ্ট। কোষের সাইটোপ্লাজম বা সারকোপ্লাজম-এ অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম মায়োফাইব্রিল পেশিতন্তুর দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত। মায়োফাইব্রিলে কোনো আড়াআড়ি রেখা দেখা যায় না। পৌষ্টিকনালি, রক্তনালি, শ্বাসনালি, মূত্রথলি, জরায়ু প্রভৃতি অঙ্গের প্রাচীরে এ পেশি পাওয়া যায়। মসৃণ পেশিগুলো **আন্তরযন্ত্রীয়** (visceral) অঙ্গের প্রাচীরে থাকে বলে এগুলোকে **ভিসেরাল** পেশিও বলে।

চিত্র ৭.৩৩ : অন্ননালির প্রাচীরে অবস্থিত মসৃণ পেশি

কাজ : এ টিস্যুর সংকোচন-প্রসারণ ক্ষমতা ধীর ও দীর্ঘস্থায়ী। বিভিন্ন বস্তুর যাতায়াত নিয়ন্ত্রণে এ টিস্যু অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। যেমন– খাদ্যবস্তু এ টিস্যুর মাধ্যমে **পেরিস্ট্যালসিস** (peristalsis) প্রক্রিয়ায় পৌষ্টিকনালির উপরের অংশ থেকে নিচের দিকে ধাবিত হয়। এ পেশির সংকোচন প্রাণীর ইচ্ছানির্ভর নয় বলে একে **অনৈচ্ছিক পেশি** বলা হয়ে থাকে।

২. হৃৎপেশি বা কার্ডিয়াক পেশি (Cardiac muscle)

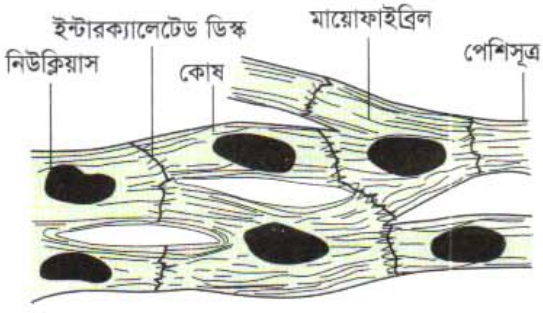

চিত্র ৭.৩৪ : হৃৎপেশি

গঠনের দিক থেকে এটি অনেকটা রৈখিক পেশির মতো। পেশিতন্তুর মায়োফাইব্রিলের গায়ে আড়াআড়ি রেখা থাকে; কিন্তু পেশিতন্তুগুলো পরস্পর অনিয়তভাবে যুক্ত থেকে জালের মতো গঠন সৃষ্টি করে। সারকোলেমা বেশ সূক্ষ্ম এবং নিউক্লিয়াসটি কোষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে। কোষগুলোর দৈর্ঘ্য প্রায় ০.৮ মিলিমিটার এবং ব্যাস ১২–১৫ μm হয়। কোষগুলোর সংযোগস্থলে কোষপর্দা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে এক বিশেষ অনুপ্রস্থ রেখার সৃষ্টি করে। একে **ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক** (intercalated disc) বলে। এ ডিস্ক হৃৎপেশির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। একমাত্র হৃৎপিন্ডের প্রাচীরে এ ধরনের পেশি টিস্যু পাওয়া যায়।

কাজ : এ টিস্যুর সংকোচন-প্রসারণ ক্ষমতা পরিমিতভাবে দ্রুত, কখনও ক্লান্ত হয় না। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণ ঘটিয়ে প্রাণিদেহে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হৃৎপেশির কাজ। হৃৎপেশির কার্যকারিতা প্রাণীর ইচ্ছানির্ভর নয়। তাই কাজের দিক থেকে এ পেশি **অনৈচ্ছিক**। হৃৎপেশি কখনও ক্লান্ত হয়না।

৩. কঙ্কাল বা রৈখিক (চিহ্নিত) বা ঐচ্ছিক পেশি (Striated or Voluntary muscle)

প্রাণিদেহের যে অংশগুলোকে সাধারণত আমরা মাংস বলে থাকি প্রকৃতপক্ষে সেগুলোই **কঙ্কাল** বা **রৈখিক** বা **চিহ্নিত পেশি**। কোষগুলো দেখতে নলাকার (cylindrical), ১–৪ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১০-৪০ μm ব্যাসবিশিষ্ট হয়। তাই কোষগুলোকে সূক্ষ্ম তন্তুর মতো দেখায় এবং **পেশিতন্তু** (muscle fibre) নামে আখ্যায়িত করা হয়। তন্তুগুলো আলাদা বা বিক্ষিপ্ত না থেকে গুচ্ছবদ্ধ থাকে। পেশিতন্তুর এধরনের গুচ্ছকে **ফ্যাসিকুলাস** (fasciculus; বহুবচনে fasciculi) বলা হয়। প্রতিটি গুচ্ছ **পেরিমাইসিয়াম** (perimysium) নামক যোজক টিস্যু নির্মিত আবরণে আবৃত। অনেক ফ্যাসিকুলি একত্রিত হয়ে একটি বড় গুচ্ছ গঠন করে। গুচ্ছটি **এপিমাইসিয়াম** (epimysium) নামক আরেক ধরনের যোজক টিস্যু নির্মিত আবরণে আবৃত থাকে। ঐচ্ছিক পেশিগুলো দেহাভ্যন্তরে এভাবে গুচ্ছাকারে অবস্থান করে। প্রতিটি পেশিতন্তু **সারকোলেমা** (sarcolemma) নামক সুস্পষ্ট এক আবরণে আবৃত। এর ঠিক নিচে কয়েকশ' গোল বা ডিম্বাকার নিউক্লিয়াস দেখা যায়। প্রতিটি পেশিকোষের অভ্যন্তরে কতকগুলো অতি সূক্ষ্ম তন্তু পাওয়া যায়, এগুলো **মায়োফাইব্রিল** (myofibril)। প্রধানত **অ্যাকটিন** (actin) ও **মায়োসিন** (myosin) নামক প্রোটিন দিয়ে মায়োফাইব্রিল গঠিত হয়। অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে এসব উপতন্তুগুলোর সমস্ত দেহ জুড়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে অবস্থিত কতকগুলো **অনুপ্রস্থ রেখা** দেখা যায়। এ রেখাগুলোর (দাগগুলো) উপস্থিতির জন্য এ পেশিটিস্যুকে **রৈখিক পেশি** বা **চিহ্নিত পেশি** বলে।

চিত্র ৭.৩৫ : রৈখিক পেশি

অবস্থান : বড় বড় অস্থির সংযোগস্থলে এ ধরনের পেশি বেশি পাওয়া যায়, আর সে কারণেই এগুলোকে **কঙ্কাল** পেশি (skeletal muscle)–ও বলা হয়ে থাকে। চোখে, জিহ্বায়, গলবিলেও এপেশি অবস্থান করে।

কাজ : এ ধরনের পেশির সংকোচন-প্রসারণ ক্ষমতা খুব **দ্রুত ও শক্তিশালী**। হাত ও পা-এর বড় বড় অস্থিসহ দেহের অন্যান্য অস্থির সঞ্চালনে এ পেশিটিস্যুই দায়িত্ব পালন করে। প্রাণীর চলন এ পেশির মাধ্যমে ঘটে। এ পেশির কাজ প্রাণীর ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই রৈখিক পেশিকে **ঐচ্ছিক পেশি** বলে আখ্যায়িত করা হয়।

চিহ্নিত পেশির প্রকারভেদ : কাজের ভিত্তিতে চিহ্নিত বা ঐচ্ছিক পেশি বিভিন্ন ধরনের হয়।

- **ফ্লেক্সর পেশি** (Flexor muscle) : এ পেশি দেহের কোন অংশকে অপর কোন অংশের উপর ভাঁজ হতে সাহায্য করে। যেমন– **বাইসেপস** পুরোবাহুকে (fore arm) উর্ধ্ব বাহুর (upper arm) উপর ভাঁজ হতে সহায়তা করে।
- **এক্সটেনসর পেশি** (Extensor muscle) : এ পেশি ভাঁজ করা অংশকে পুনরায় সোজা হতে সহায়তা করে। যেমন– **ট্রাইসেপস** ভাঁজ করা পুরোবাহুকে সোজা হতে সাহায্য করে।
- **অ্যাবডাকটর পেশি** (Abductor muscle) : এটি দেহের কোন অংশকে দেহের অক্ষ থেকে দূরে সরে যেতে সহায়তা করে। যেমন : **ডেলটয়েড** হাতকে সামনে প্রসারিত হতে সহায়তা করে থাকে।
- **অ্যাডাক্টর পেশি** (Adductor muscle) :এ পেশি দেহের কোন অংশকে দেহ অক্ষের কাছে নিকটে আনতে সাহায্য করে যেমন– **লাটিসিমাস ডরসি** হাতকে পিছনে এবং উপরে উঠাতে সাহায্য করে।
- **ডিপ্রেসর পেশি** (Depressor muscle) : এটি দেহের কোন অংশকে নিচে নামাতে অংশ নেয়; যেমন **ডিপ্রেসর ম্যান্ডিবুলার** নিম্ন চোয়ালকে নিচের দিকে নামাতে সাহায্য করে; ফলে মুখ খুলতে পারে।
- **লিভেটর পেশি** (Levator muscle) :এটি দেহের কোন অংশকে উপরে উঠতে সহায়তা করে; যেমন- **ম্যাসেটর পেশি** নিম্ন চোয়ালকে উপরের দিকে উঠতে সাহায্য করে; ফলে খোলা মুখ বন্ধ হয়ে যায়।
- **রোটেটর পেশি** (Rotator muscle) : এটি দেহের কোন অংশের আবর্তনে সহায়তা করে। যেমন-**পাইরিফরমিস পেশি** ফিমারকে ঘূর্ণনে সাহায্য কাজ করে।

পেশিতে টান পড়ে কিন্তু ধাক্কা দেয় না (Muscle can Pull but can not Push)

পেশি আমাদের চলন ও ভঙ্গিমা নিয়ন্ত্রণ করে, মানবদেহের স্বাভাবিক কর্মকান্ড পরিচালনায় প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে। পেশির ব্যবহার এক-দুদিনের নয়, নিত্যদিনের। প্রতিটি কাজ পেশি নির্ভর। আমরা জানি মানবদেহে ৩ ধরনের পেশি আছে। মসৃণপেশি, হৃৎপেশি ও কঙ্কালপেশি। এগুলো সুসমন্বিত কাজের মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট রয়েছে।

পেশি কীভাবে কাজ করে সে বিষয়ে আমাদের অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। আমরা প্রত্যেকদিন কাজ করি। বাঁকা হই, টেবিল থেকে, মাটি থেকে কিছু তুলে নেই, আরও কতো কি। সবকিছুরই মূলে রয়েছে কিছু জোড় পেশির জটিল কর্মকান্ড। যেমন-হাত ভাঁজ করা-সোজা করা বিষয়টি দেখতে যত সহজ সাবলীল মনে হয়, এর গূঢ়তত্ত্ব ঠিক ততোখানি কঠিন। এর মূল রহস্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পেশিগুলো সংকুচিত হয় ও টান দেয়, কিন্তু ধাক্কা দেয় না বরং প্রসারিত থাকে।

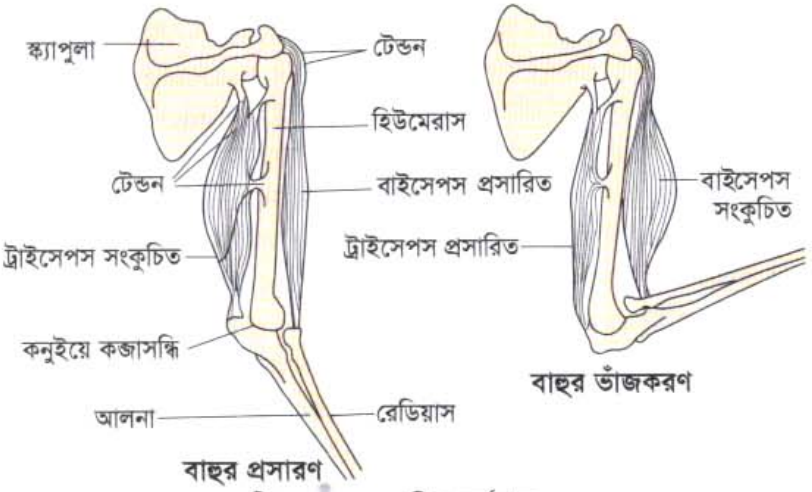

চিত্র ৭.৩৬ : পেশির কর্মকান্ড

মানবদেহের কঙ্কালিক পেশিগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে, এগুলোর কাজ পরস্পর বিপরীতমুখী (প্রতিপক্ষীয় জোড়, antagonistic pairs)। **বাইসেপস** (biceps) ও **ট্রাইসেপস** (triceps) বাহুর অন্যতম প্রধান পেশি। বাইসেপস হচ্ছে নিম্নবাহুর রেডিয়াসের উপরে অবস্থিত পেশি যা কনুই সন্ধিকে বাঁকিয়ে নিম্নবাহুকে উর্ধ্ববাহুর উপর ভাঁজ হতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, আলনার নিচে অবস্থিত পেশি ট্রাইসেপসের কাজ হলো কনুই সোজা করে ভাঁজ হওয়া নিম্নবাহুকে টেনে সোজা করে উর্ধ্ববাহু থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া। পেশিগুলো এমনভাবেই গঠিত যাতে কেবল **সংকুচিত হতে পারে (অর্থাৎ টান দিতে পারে), ধাক্কা দিতে পারে না**। পেশি নিজে বাঁকা হয় না, সন্ধিকে টেনে বাঁকিয়ে আনে। এভাবে বাঁকিয়ে এনে সন্ধি-কোণ কমিয়ে দেওয়ার কাজে নিয়োজিত বাইসেপসকে **ফ্লেক্সর** (flexor) এবং সন্ধি-কোণকে বাড়িয়ে দিয়ে অর্থাৎ সোজা করিয়ে দেয়ায় ট্রাইসেপককে **এক্সটেন্সর** (extensor) বলে।

অ্যাকটিন ও মায়োসিন এ দুধরনের প্রোটিন থাকে বলে পেশি টানতে পারে। এসব প্রোটিন পেশিকোষের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। সংশিষ্ট পেশির প্রতিটি কোষ মস্তিষ্কের কোনো অংশ থেকে সংকোচনের সংকেত পেলে মস্তিষ্কের অন্য অংশ থেকে পৃথক বৈদ্যুতিক উদ্দীপনাগুলোকে সমন্বিত করে 'টান' দেওয়ার কাজটি সম্পন্ন করে। হাড়কে আগের অবস্থানে ফিরিয়ে নিতে বিপরীতধর্মী পেশিও সম্মিলিতভাবে একই কাজ করে অর্থাৎ টেনে সোজা করে দেয়। এ কারণেই বলা হয় যে, **পেশিতে টান পড়ে কিন্তু ধাক্কা দেয় না**।

ব্যবহারিক (Practical)

প্রস্তুতকৃত স্লাইডের সাহায্যে মসৃণ পেশি ও হৃৎপেশির তুলনা পর্যবেক্ষণ।

পাশাপাশি দুটি অণুবীক্ষণযন্ত্রে একটিতে মসৃণ পেশির স্লাইড এবং অন্যটিতে হৃৎপেশির স্লাইড স্থাপন করে উভয় পেশি পর্যবেক্ষণ করে এদের কাঠামোগত তুলনা লিপিবদ্ধ করা হলো।

চিত্র ৭.৩৭ : মসৃণ পেশি (বায়ে) এবং হৃৎপেশি (ডানে)

মসৃণ পেশি ও হৃৎপেশির তুলনা		
তুলনীয় বিষয়	মসৃণ পেশি	হৃৎপেশি
১. আকার ও আকৃতি	পেশিতন্তুগুলো লম্বা ও মাকু আকৃতির এবং শাখাবিহীন।	পেশিতন্তুগুলো খাটো ও বেলনাকার এবং শাখাযুক্ত।
২. অনুপ্রস্থ রেখা	তন্তুতে অনুপ্রস্থ রেখা নেই।	অনুপ্রস্থ রেখা উপস্থিত।
৩. ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক	থাকে না।	কোষগুলোর সংযোগস্থলে থাকে।
৪. সারকোলেমা	পেশিকোষের আবরণ বা সারকোলেমা অস্পষ্ট।	সারকোলেমা সূক্ষ্ম।
৫. নিউক্লিয়াস	কোষের চওড়া অংশে অবস্থান করে।	কোষের কেন্দ্রে অবস্থান করে।
৬. মায়োফাইব্রিল	পেশিতন্তুর দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত।	পরস্পর অনিয়তভাবে যুক্ত হয়ে জালিকা গঠন করে।

কঙ্কালের কার্যক্রম এবং 'রডস ও লিভার' তন্ত্র
(The action of Skeleton and "Rods & Lever" System)

কঙ্কালিক পেশি আলাদাভাবে কাজ করতে পারে না। একটি পেশি যখন কঙ্কালের সঙ্গে যুক্ত থাকে তখন সংযোগের স্থান ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয় এর বল, গতি ও সঞ্চালনের মাত্রা কেমন হবে। এসব বৈশিষ্ট্য স্বাধীন এবং এদের সম্পর্ক নির্ভর করে পেশি ও কঙ্কালতন্ত্রের সাধারণ গঠনের উপর। নির্দিষ্ট একটি পেশির সংকোচনে যে বল, গতি ও সঞ্চালনের দিক প্রকাশ পায় তা বদলে দেওয়া যাবে যদি ঐ পেশিকে একটি লিভারের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যায়। **লিভার** (lever) এমন একটি অনমনীয় **রড** (rod) যা সন্ধির মাধ্যমে সৃষ্ট একটি স্থায়ী পয়েন্ট বরাবর ঘুরতে সক্ষম। শিশুদের দোলায়মান বা টলায়মান দাঁড়ান বা হাঁটা লিভার ক্রিয়ার পরিচিত উদাহরণ। লিভারের মাধ্যমে (১) আরোপিত (applied) দিক, (২) আরোপিত বলের ফলে সৃষ্ট চলনের দূরত্ব ও গতি এবং (৩) আরোপিত বলের কার্যকর শক্তি (effective strength) পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ পেশিটানের ক্রিয়া কঙ্কালতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে যেভাবে প্রকাশিত হয় তাতে কঙ্কালতন্ত্রে রড ও লিভার তন্ত্রের প্রভাব এবং আমাদের হাত-পাগুলোকে মেশিন ছাড়া আর কিছু ভাবার উপায় নেই। লিভারের প্রতি যে কোন বলপ্রয়োগকে বলে **প্রচেষ্টা** (effort)। যে বলপ্রয়োগে লিভারের চলন বাধাগ্রস্থ হয় (যেমন- দন্ডের উপর ওজনের কারণে নিম্নমূখি বল প্রয়োগ) তাকে বলে **ভার** (load) বা **প্রতিবন্ধক** (resistance)। পেশির সংকোচন হচ্ছে প্রচেষ্টা, আর এতে সংশ্লিষ্ট দেহের অংশটি হচ্ছে ভার বা বাধা। শরীরের হাড়গুলো লিভার (যান্ত্রিক কৌশল) হিসেবে কাজ করে, ফলে গতি বা শক্তির এক যান্ত্রিক সুবিধার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ লিভারের ব্যবহারে একটি ক্ষুদ্র **বল** (force) বিরাট বল-এ পরিবর্তিত হতে পারে। পায়ের পেশির সামান্য সংকোচনের ফলে পায়ের শীর্ষে বৃহত্তর সঞ্চালন একটি ফুটবলকে সজোরে দূরে পাঠাতে সাহায্য করে। এটাই হচ্ছে যান্ত্রিক সুবিধা (mechanical advantage)।

লিভারের গঠন (Structure of Lever)

একটি লিভার ৪টি অংশ দিয়ে গঠিত :

১. **লিভার-বাহু** (Lever arms)- হাড়গুলো লিভার-বাহু হিসেবে কাজ করে;

২. **পিভট** (Pivot)- যে অস্থিসন্ধিকে কেন্দ্র করে লিভারের কাজ কর্ম পরিচালিত হয়;

৩. **প্রচেষ্টা** (Effort)- ভার সরানো বা নড়ানোর জন্য পেশি যে বল (force) সরবরাহ করে; এবং

৪. **ভার** (Load)- দেহের কোনো অংশের ওজন যা সরাতে হবে বা উঠাতে হবে কিংবা দেহের ভিতরে বা বাইরে নিতে হবে।

লিভারের প্রকারভেদ (Types of Lever)

পিভট, প্রচেষ্টা ও ভার-এর অবস্থানের ভিত্তিতে লিভার নিচে বর্ণিত ৩ রকম।

১. **প্রথম-শ্রেণির লিভার** (First-class lever) : এ ধরনের লিভারে পিভটটি ভার ও প্রচেষ্টার মাঝখানে অবস্থান করে। **কাঁচি** এ ধরনের লিভার, কিন্তু মানবদেহে প্রথম-শ্রেণি লিভার দুর্লভ। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, মাথা ও প্রথম কশেরুকার মধ্যবর্তী সন্ধিটি। এক্ষেত্রে মাথার খুলি হচ্ছে লিভার-বাহু; খুলি ও প্রথম কশেরুকা (অ্যাটলাস)-র মধ্যকার সন্ধিটি পিভট; মাথার পিছনে অবস্থিত পেশি থেকে আসা পেশল ক্রিয়া হচ্ছে প্রচেষ্টা; এবং ভার হচ্ছে মাথার

ওজন যা প্রচেষ্টার কর্মকান্ডে উঁচু হয়ে থাকে (ওজনের বিরুদ্ধে)। পেশি (প্রচেষ্টা) শিথিল হলে মাথা ঝুঁকে পড়ে। এ লিভারের মাধ্যমে **অল্প বল প্রয়োগে বেশি ফল** পাওয়া যায়।

২. দ্বিতীয়-শ্রেণির লিভার (Second-class lever) : এ ধরনের লিভারে ভারের অবস্থান থাকে পিভট ও প্রচেষ্টার মাঝখানে। **ঠেলাগাড়ি** এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঠেলাগাড়ির মেঝেয় যে মাল রাখা হয় সেটি ভার। এ অংশটি থাকে পিভটরূপী হুইল আর প্রচেষ্টারূপী ঠেলাচালকের হাতের মধ্যবর্তী স্থানে। পায়ের আঙ্গুলের ডগায় দাঁড়ালে দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার সৃষ্টি হয়। তখন আঙ্গুলের সন্ধিগুলো হয় পিভট, দুপা লিভার-বাহু, কাফ-পেশি ও গোড়ালির টেন্ডন প্রচেষ্টা (যখন কাফ পেশি সংকুচিত হয়) এবং দেহের ওজন হচ্ছে ভার (যা পেশি সংকোচনের ফলে উপরে উত্থিত হয়)। এ ধরনের লিভারের সাহায্যে **সামান্য প্রচেষ্টায় বেশি ওজনকে উপরে তুলে ধরা সহজ হয়।**

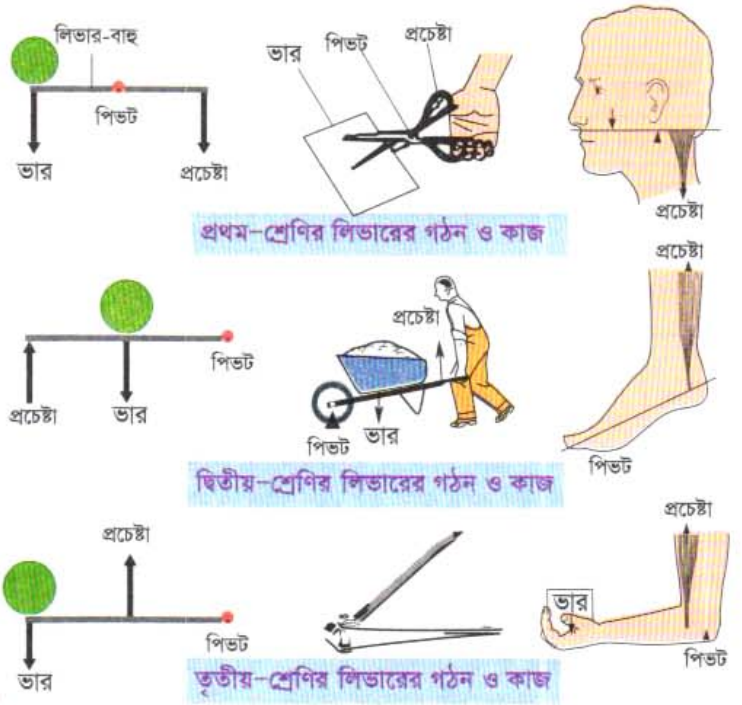

চিত্র ৭.৩৮ : বিভিন্ন ধরনের লিভারের গঠন ও কাজ

৩. তৃতীয়-শ্রেণির লিভার (Third-class lever) : এ ধরনের লিভারের প্রচেষ্টা থাকে পিভট ও ভার-এর মাঝখানে। উদাহরণ হিসেবে নখ কাটার যন্ত্রের (nail flipper) কথা উল্লেখ করা যায়। মানবদেহে তৃতীয়-শ্রেণির লিভারের সংখ্যা অনেক। একটি **ভাঁজ করা বাহুকে** তৃতীয়-শ্রেণির লিভার বলা যায়। এ ক্ষেত্রে কনুইয়ে রয়েছে পিভট (কনুই-সন্ধি), সম্মুখ বাহু হচ্ছে লিভার-বাহু, বাইসেপস পেশি প্রচেষ্টার যোগান দেয়, আর সম্মুখ বাহু কিংবা কোনো ওজনদার বস্তুসহ সম্মুখ বাহু হচ্ছে ভার। তৃতীয় শ্রেণির লিভারে প্রচেষ্টার অবস্থান ভার ও পিভটের মাঝে বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রচেষ্টা আর পিভট খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। প্রচেষ্টার চেয়ে ভার বেশি হওয়ায় এ ক্ষেত্রে কোনো যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় না। তবে বাইসেপস পেশির সামান্য সংকোচনে সম্মুখ বাহুতে বৃহত্তর সঞ্চালনের সৃষ্টি হয় বলে যান্ত্রিক অসুবিধাটুকু পূরণ হয়ে যায়। **দ্রুতগতির সঞ্চালন** (movement) সুবিধা পাওয়া যায় এ ধরনের লিভার থেকে।

হাঁটু সঞ্চালনে অস্থি ও পেশির সমন্বয়
(Coordination of Bones and Muscles in the Knee Movement)

মানুষের চলনে শুধু পেশি নয়, পেশির সঙ্গে যুক্ত অস্থির ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অস্থি দেহের কঙ্কালতন্ত্র গঠন করে। কঙ্কালতন্ত্র দেহের অবয়বের কাঠামো। কাঠামোর উপরে আচ্ছাদন হিসেবে থাকে **পেশিতন্ত্র** (muscular system)। এ পেশি **ঐচ্ছিক** (voluntary) প্রকৃতির হওয়ায় মানুষ দেহকে বা দেহের কোনো উপাঙ্গকে যথেচ্ছ আন্দোলিত করতে পারে। **কন্ডরা** বা **টেন্ডন** (tendon) দিয়ে পেশি অস্থির সংগে যুক্ত থাকে। তাই কোনো অঙ্গকে যথেচ্ছ পরিচালনা করা বা স্থানান্তরে নেয়া **পেশি-কঙ্কালতন্ত্রের** (musculo-skeletal system) পারস্পরিক ছন্দোবদ্ধ ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভরশীল। হাঁটু সঞ্চালনে অস্থি ও পেশি যেভাবে সমন্বয় সাধন করে তা নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১. বক্রীকরণ পেশি (Flexor) : জানুসন্ধি (knee joint) পিছন দিকে বাঁকাতে দুটি পেশিগুচ্ছের প্রয়োজন হয়, এদের **হ্যামস্ট্রিং পেশি** (hamstring muscle) এবং **গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস পেশি** (gastrocnemius muscle) বলে। হ্যামস্ট্রিং পেশি তিনটি পেশি নিয়ে গঠিত। এগুলো যথাক্রমে **বাইসেপস ফিমোরিস** (biceps femoris), **সেমিমেম্ব্রোনোসাস** (semimembronosus) এবং **সেমিটেন্ডিনোসাস** (semitendinosus)। পেশিগুলো উরুর পিছনে থাকে। এগুলো শ্রোণিচক্রের **ইশ্চিয়াম** (ischium) অংশে উৎপন্ন হয়ে ফিমারের পিছন দিয়ে **টিবিয়া** (tibia)-র উপরে যুক্ত হয়েছে। এদের সঙ্কোচনে ফিমার ও টিবিয়া কাছাকাছি আসে এবং হাঁটুসন্ধিতে ভাঁজ সৃষ্টি হয়।

গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস পেশি টিবিয়ার পেছনে অবস্থিত পায়ের ডিম বা গুলির প্রধান পেশি। এটি ফিমারের **কনডাইল** (condyle) থেকে সৃষ্টি হয়ে টিবিয়ার পেছন দিয়ে গোড়ালিঅস্থি বা **ক্যালকেনিয়াস** (calcaneus) -এর সঙ্গে **অ্যাকিলিস কন্ডরা** (achilles tendon or calcanean tendon) দিয়ে যুক্ত হয়। এর সঙ্কোচনে ফিমার ও টিবিয়া নিকটবর্তী হয়, ফলে হাঁটুসন্ধি পেছন দিকে ভাঁজ হয়।

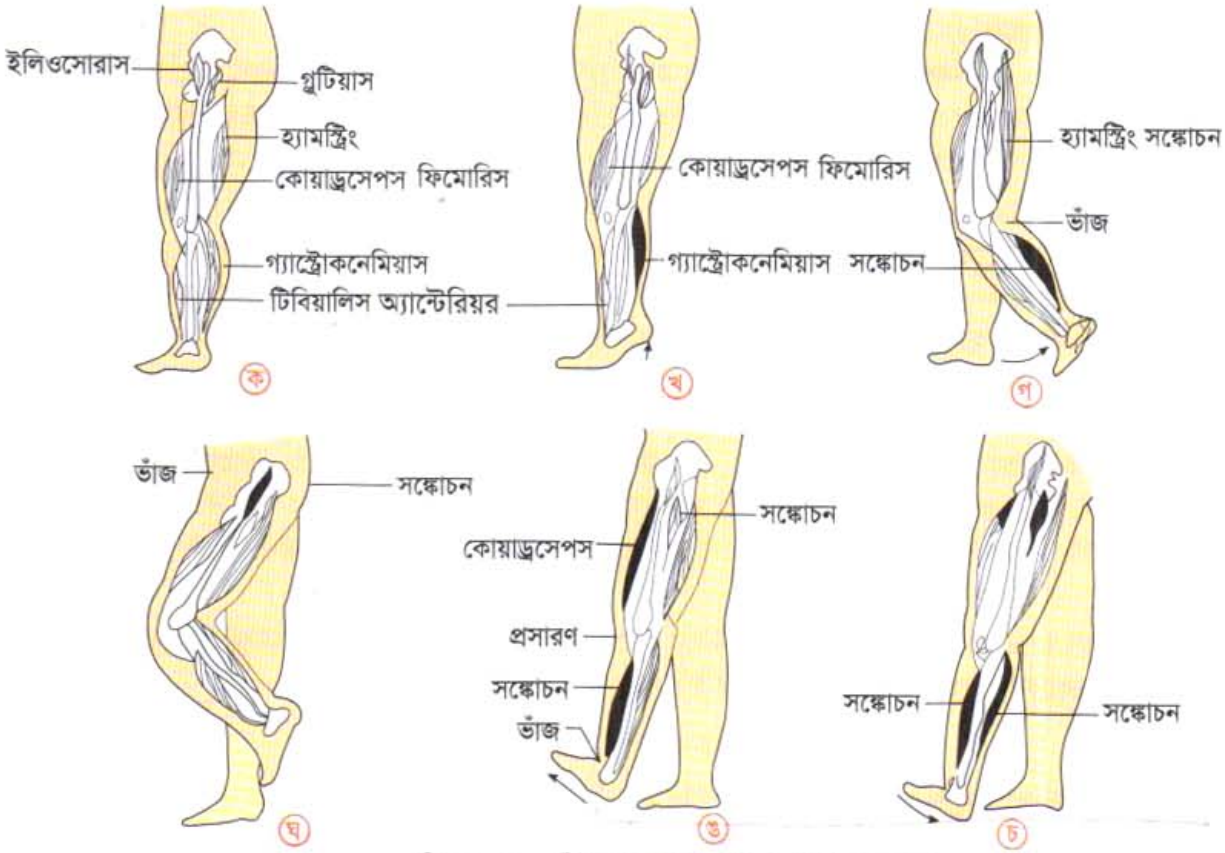

চিত্র ৭.৩৯ : হাঁটু সঞ্চালনে অস্থি ও পেশির সমন্বয়

২. প্রসারণ পেশি (Extensor) : উরুর সামনে অবস্থিত চারটি পেশি নিয়ে গঠিত **কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস** (quadriceps femoris) হাঁটুসন্ধির প্রসারণ ঘটায়। এটি শ্রোণি থেকে উৎপন্ন **রেকটাস ফিমোরিস** (rectus femoris) এবং ফিমারের সামনে থেকে উৎপন্ন তিনটি ভ্যাসটি পেশি **ভ্যাসটাস মিডিয়ালিস** (vastas medialis), **ভ্যাসটাস ল্যাটারালিস** (vastas lateralis) এবং **ভ্যাসটাস ইন্টারমিডিয়াস** (vastas intermedius) নিয়ে গঠিত। এ তিনটি পেশি একসঙ্গে **প্যাটেলা** (patella)-র টেন্ডনের মাধ্যমে টিবিয়ার সামনে যুক্ত হয়। এসব পেশির সঙ্কোচনে হাঁটুসন্ধির প্রসারণ ঘটে।

অস্থিভঙ্গ বা হাড়ভাঙ্গা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা (Fracture of Bone and First Aid)

অস্থিভঙ্গ হচ্ছে এমন এক চিকিৎসাগত অবস্থা যেখানে রোগী অভিন্ন হাড়ের কোথাও ভেঙ্গে যাওয়াজনিত অসুস্থতায় ভোগে। প্রচন্ড শক্তি, চাপ কিংবা বিভিন্ন অসুখে (অস্টিওপোরোসিস, অস্থিক্যান্সার ইত্যাদি) ভঙ্গুর হয়ে যাওয়ায় অস্থিভঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি হয়। অস্থিভঙ্গ প্রধানত তিন ধরনের : **সাধারণ, যৌগিক** ও **জটিল**। নিচে এদের বিবরণ দেয়া হলো।

সাধারণ হাড়ভাঙ্গা (Simple Fracture)

যে ধরনের অস্থিভঙ্গে ভঙ্গ অস্থি চামড়া বিদীর্ণ করে বের হয় না তাকে **সাধারণ অস্থিভঙ্গ** বলে। এ ধরনের অস্থিভঙ্গে হাড় শুধু দুই টুকরা হয়ে যায়, এর বেশি কিছু নয়। হাড় ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে না বলে এ ধরনের অস্থিভঙ্গের আরেক নাম **বদ্ধ অস্থিভঙ্গ** (closed fracture)।

সাধারণ অস্থিভঙ্গের লক্ষণ (Symptoms of Simple Fracture)

(i) আঘাতপ্রাপ্ত স্থান সঙ্গে সঙ্গে ফুলে যায়; (ii) রক্ত জমে কাল শিরা পড়ে; (iii) আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গ নড়াচড়া করতে ব্যথা লাগে এবং ভতরে সূঁচ ফুটার মতো ব্যথা অনুভূত হয়; (iv) প্রচণ্ড ব্যথা হয়; (iv) সামান্য ভারী কোনো জিনিস তুলতে পারে না; (vi) হাত, পা অসাড় হয়; (vii) হাত, পা অথবা সন্ধির আকার পরিবর্তন হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid)

অস্থিভঙ্গের কারণে দেহকষ্ট যেন না বাড়ে সে জন্য দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োজন। এ চিকিৎসা সম্বন্ধে অজ্ঞ কোনো ব্যক্তি যেন আঘাতপ্রাপ্ত জায়গায় হাতও না দেয় সে বিষয়ে অত্যন্ত সর্তক থাকতে হবে এবং দ্রুত যে পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে হবে তা হচ্ছে:

(i) অস্থিভঙ্গের মাত্রা ও সঠিক স্থান চিহ্নিত করতে হবে। (ii) আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির নড়াচড়া বন্ধ রাখতে হবে। (iii) সমস্ত ক্ষত পরিষ্কার করতে হবে। (iv) রক্ত সঞ্চালনে বাধা হতে পারে এমন টাইট জামা-কাপড়, গয়না-গাটি সরিয়ে ফেলতে হবে তা না হলে ভাঙ্গা হাড়ে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। (v) ভাঙ্গা হাড়ের জায়গায় রক্তপ্রবাহ, সঞ্চালন ও সংবেদন পরীক্ষা করতে হবে। (vi) ভাঙ্গা হাড় যথাস্থানে বসানোর জন্য তার সঙ্গে কাঠের খন্ড বা বাঁশের চটি বেঁধে দিতে হবে। (vii) রক্ত প্রবাহ ও সঞ্চালন পুনর্বার পরীক্ষা করতে হবে। (viii) ভাঙ্গা হাড়ের জায়গাটি যেন ফুলে না উঠে সে জন্য আঘাত পাওয়া জায়গা ৬–১০ ইঞ্চি উঁচুতে রাখতে হবে। (ix) অস্থিভঙ্গের জায়গায় বরফ দেওয়া যেতে পারে তবে দেখতে হবে জায়গাটি যেন ঠান্ডায় অসাড় না হয়ে যায়। (x) "হঠাৎ ও মারাত্মক আঘাত পেয়েছে" আহত ব্যক্তি যেন এমনটি মনে না করে সে জন্য তাকে চাঙ্গা রাখতে হবে এবং মাথা, ঘাড় ও শরীরের বিভিন্ন অংশ সাবধানে নড়াচড়া করতে হবে। (xi) মানসিক আঘাতে কাহিল না হলে রোগীকে ব্যথানাশক ওষুধ দিতে হবে। দ্রুত আঘাতপ্রাপ্তির স্থল থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

পরবর্তী ধাপ হচ্ছে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। চিকিৎসক প্লাস্টার লাগিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবস্থা ও চিকিৎসাপত্র দেবেন। দেখা গেছে, সাধারণ অস্থিভঙ্গ ৮ সপ্তাহের মধ্যে সেরে যায়।

যৌগিক হাড়ভাঙ্গা (Compound Fracture)

যৌগিক হাড়ভাঙ্গা **উন্মুক্ত হাড়ভাঙ্গা** নামেও পরিচিত। সাধারণত খেলাধূলার সময় কিংবা সড়ক দুর্ঘটনায় এ ধরনের হাড়ভাঙ্গা ঘটে, তখন হাড়ের টুকরা চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসে। এটি বেশ জটিল হাড়ভাঙ্গা কারণ এতে প্রচুর পরিমাণ রক্তপাত হয় এবং দ্রুত সংক্রমণ ঘটে। যৌগিক হাড়ভাঙ্গার ক্ষেত্রেও সাধারণ হাড়ভাঙ্গার মতো প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া যেতে পারে, তবে তা ক্ষণকালীন। কারণ যৌগিক হাড়ভাঙ্গা এত গুরুতর যা অস্ত্রোপচার ছাড়া বিকল্প চিকিৎসা নেই।

যৌগিক হাড়ভাঙ্গার প্রকারভেদ

হাড়ভাঙ্গার প্রকৃতির ভিত্তিতে যৌগিক হাড়ভাঙ্গাকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

ধরন ১ : ক্ষতের পরিমাণ কম, চামড়ায় ১ সে.মি.-এর বেশি ক্ষত দেখা যায় না এবং রক্তপাতও হয় কম।

ধরন ২ : ক্ষতের পরিমাণ বেশি, চামড়ায় ১ সে.মি.-এর বেশি ক্ষত, টিস্যুর ক্ষতি দেখা যায় না এবং চামড়ারও তেমন ক্ষতি হয় না।

ধরন ৩ : এক্ষেত্রে চামড়া, টিস্যু ও হাড়ের মারাত্মক ক্ষতি হয়। রক্তপাত, সংক্রমণ এড়াতে দ্রুত চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হয়।

চিত্র ৭.৪০ : বিভিন্ন ধরনের হাড়ভাঙ্গা

যৌগিক হাড়ভাঙ্গার লক্ষণ

হাড় ভেঙ্গে টিস্যু ও চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসা, প্রচুর রক্তপাত ও যন্ত্রণাময় ক্ষত সৃষ্টি হওয়া যৌগিক হাড়ভাঙ্গার লক্ষণ।

৪. কাঁধ ও নিতম্বের স্থানচ্যুতি ঘটলে হাত ও পা নড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ে।
৫. আঙ্গুলে স্থানচ্যুতি ঘটলে গোটা হাতই অকেজো হয়ে পড়ে।
৬. স্নায়ু অথবা রক্তনালি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে অস্থি সন্ধি সাময়িকভাবে অবশ হয়ে যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা

১. স্থানচ্যুত অস্থির নড়াচড়া বন্ধ করতে হবে।
২. কোনো অবস্থাতেই নিজেরাই চাপাচাপি করে বিচ্যুত অস্থিকে পূর্বের স্থানে বসানোর চেষ্টা করা যাবে না। এতে অস্থি সন্ধির চারিদিকের লিগামেন্ট, টেন্ডন পেশি ছিঁড়ে গিয়ে পরিণতি আরও খারাপ হতে পারে।
৩. কাঁধ, কনুই সন্ধি বা গোড়ালিতে স্থানচ্যুতি ঘটলে বিচ্যুত অস্থিকে যথাস্থানে বসানোর পর ঐ স্থানে চটি বা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে হবে যাতে অস্থিটি আরও সরে না যায়।
৪. ত্বকে ক্ষতের সৃষ্টি হলে পানি দিয়ে পরিষ্কার করে জীবাণুর সংক্রমণ রোধ করতে হবে।
৫. ক্ষতস্থান ফুলে গেলে ফোলা কমানোর জন্য আইস প্যাক বা বরফ লাগাতে হবে।
৬. ব্যথা উপশমের জন্য ভরা পেটে ব্যথানাশক ওষুধ সেবন করানো যেতে পারে।
৭. দুর্ঘটনা যদি মারাত্মক হয় তবে যত দ্রুত সম্ভব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।

প্রতিরোধ

দুর্ঘটনায় স্থানচ্যুতি হলে আঘাতের ফলাফল নিয়ে মন্তব্য করা কঠিন। তবে সবসময় সাবধানতা অবলম্বন করলে স্থানচ্যুতির মতো যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার হাত থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। অতএব, খেলাধূলা, চলাফেরা বা যানবাহনে চলার সময় আগে থেকেই সর্তক থাকলে অনেক গুরুতর ক্ষতি থেকে বাঁচা সম্ভব হয়।

২. মচকানো (Sprains)

অস্থিসন্ধিতে আঘাতের ফলে সন্ধিকে অবলম্বন দানকারী লিগামেন্টে সৃষ্টি হয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা টান কিংবা লিগামেন্ট ছিঁড়েও যেতে পারে। এমন অবস্থাকে সাধারণভাবে **মচকানো** নামে অভিহিত করা হয়। লিগামেন্ট হচ্ছে টিস্যু-নির্মিত স্থূল ব্যান্ড যা সন্ধিকে নির্দিষ্ট দিকে সঞ্চালনে অনুমতি দেয়। কিছু সন্ধি বিভিন্ন দিকে সঞ্চালিত হতে পারে। এ কারণে লিগামেন্টের একাধিক গুচ্ছ অস্থিসন্ধিকে সঠিক বিন্যাসে ধরে রাখে। যখনই অস্থিসন্ধির একটি লিগামেন্টে অতিরিক্ত টান পড়ে বা ছিঁড়ে যায় তখনই মচকানো ঘটে। বলা যেতে পারে, মচকানোর প্রাথমিক ধাপে লিগামেন্ট তন্তু সটান হয়ে পড়ে; দ্বিতীয় ধাপে লিগামেন্টের কোনো অংশে চিড় ধরে; এবং শেষ ধাপে লিগামেন্ট সম্পূর্ণ ছিঁড়ে যায়।

মচকানোর স্থান

মচকানোর ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে গোড়ালিতে। দ্রুত ঘোরাতে বা মোচড়াতে গেলে গোড়ালির বাইরের ও পাশের অংশের লিগামেন্ট ছিঁড়ে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি মচকায় গোড়ালি। সামান্য মচকানো সারিয়ে তোলা গেলেও গুরুতর মচকানোর কারণে অনেকের খেলোয়াড়ি জীবন অকালে শেষ হয়ে যায়। হাঁটুর ৪টি লিগামেন্ট কব্জাসন্ধির মতো কাজ করে। এগুলো সামনে-পিছনে-দুপাশে বিন্যস্ত হয়ে হাঁটুকে সচল ও সক্রিয় রাখে। কিন্তু হাঁটুর সামনের দিকে অবস্থিত **লিগামেন্ট** (anterior cruciate ligament, ACL) সম্পূর্ণ ছিঁড়ে গেলে সবচেয়ে ক্ষতিকর মচকানো ঘটে। গাড়ি দুর্ঘটনায় ঘাড় মচকানো রোগীর সংখ্যা বেশি থাকে। গাড়ি হঠাৎ থমকে যাওয়াতে মাথার প্রচন্ড ঝাঁকুনির ফলে এ মচকানোর সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে গ্রীবা কশেরুকাগুলোর ক্ষতি হয় না; বরং যে সব লিগামেন্ট কশেরুকাগুলো যথাস্থানে রাখতে সাহায্য করে সেগুলোর ক্ষতি হয়। এর ফলে সাধারণত প্রচন্ড ব্যথা ও ঘাড় ফুলে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়, কিন্তু কখনও কখনও ঘাড় বেশি বেঁকে গেলে সুষুম্না কান্ড (স্পাইনাল কর্ড) মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। কব্জি মচকে যাওয়ার ঘটনাও কম নয়। বেস বল, ফুটবল, বোলিং, স্কেইটবোডিং, টেনিস প্রভৃতি খেলায় কব্জি মচকানো সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ বিপরীতমুখি উল্টে গেলে বৃদ্ধাঙ্গুলসহ যে কোনো আঙ্গুল মচকে যেতে পারে।

মচকানোর লক্ষণ

মচকানোর প্রথম লক্ষণ হচ্ছে ব্যথা। অনেক ক্ষেত্রে ব্যথা অনুভবের বিষয়টি দেরিতেও হতে পারে। যেমন- কোনো ব্যক্তি যদি ঘরের ভিতর রংয়ের কাজ করে এবং দিনের পর দিন হাতের উঠা-নামা চলে তাহলে অনেকদিন পর সে মচকানোর বিষয় টের পাবে। এর কারণ হচ্ছে প্রদাহ, ফুলে যাওয়া ও পেশি আক্ষেপ দেখা দিতে সময় লাগতে পারে। শরীরে ব্যথা হলেই ধরে নিতে হবে কোথাও গন্ডগোল হয়েছে। অর্থাৎ মস্তিষ্কে খবর পৌছে যায় কোন অস্থিসন্ধিতে ব্যাঘাত ঘটেছে এবং তার নিরাময় দরকার। কাজ, ব্যায়াম, খেলাধুলা শেষে ব্যথা সৃষ্টির বিষয়টি নজরে আসে। সন্ধিতে আঘাত

পাওয়ার কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে জায়গাটি ফুলে যায়। লিগামেন্ট তন্তু ছিঁড়ে গেলে রক্তপাত হয়। কিছু সময় পর চামড়ার উপরে কালশিরা পড়ে। মচকানোর জায়গায় ব্যথা ও ফুলে উঠার সঙ্গে সঙ্গে জায়গা ঘিরে পেশি-আক্ষেপের সৃষ্টি হয়, ফলে পেশি শক্ত হয়ে যায়। ব্যথা, ফোলা ও পেশি-আক্ষেপ মিলে হাঁটা-চলাই দায় হয়ে পড়ে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা

চিকিৎসা নির্ভর করে মচকানোর ধরণ ও ব্যাপকতার উপর। চিকিৎসকের পরামর্শে **নন-স্টেরয়ডাল** (non-steroidal) ওষুধ খাওয়া যেতে পারে ব্যথা কমানোর জন্যে। ভারী কিছু বহন করার ক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হবে। তবে প্রথমেই যা করতে হবে তা হচ্ছে মচকানো গুরুতর হলে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে প্রাথমিক চিকিৎসা ও বিশ্রাম নিতে হবে। গুরুতর মচকানোর ক্ষেত্রে বিশ্রাম নিতেই হবে এবং চারটি কাজ গুরুত্ব সহকারে করতে হবে। এ ৪টি কাজের ইংরেজী শব্দের প্রথম অক্ষর দিয়ে RICE নাম দিয়ে প্রচলিত আছে; বিশ্রাম (Rest) + বরফ (Ice) + ক্ষত পরিষ্কার (Compression) + উচ্চতায় রাখা (Elevation) = RICE.

বিশ্রাম : মচকানো রোগীকে বিশ্রামে রাখতে হবে। কোনো অতিরিক্ত চাপ দেওয়া যাবে না। গোড়ালি মচকালে খুব সাবধানে হাঁটতে হবে।

বরফ : মচকানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা ও ফোলা সীমিত রাখতে আক্রান্ত স্থানে বরফ দিতে হবে। এক নাগাড়ে দিনে ৩-৪ বার ১০-১৫ মিনিট করে বরফ লাগাতে হবে; এর বেশি সময় দিলে কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে।

ক্ষত পরিষ্কার : ক্ষত পরিষ্কার করে নতুন ব্যান্ডেজ এমনভাবে লাগিয়ে দিতে হবে যেন সন্ধিটি অনড় ও সঠিক অবলম্বনে থাকে। এ কাজটি অভিজ্ঞ নার্স দিয়ে করানো ভাল।

উচ্চতায় রাখা : মচকানো সন্ধিটি দেহের বাকি অংশের চেয়ে সামান্য উঁচুতে তুলে রাখতে হবে। এতে ফোলা কমে যাবে।

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

মায়োব্লাস্ট : ভ্রূণজ কোষ যা পরিশেষে পেশিকোষে রূপান্তরিত হয়।

প্যাটেলা : মানুষের হাঁটুতে অতিরিক্ত অস্থি হিসেবে হাঁটুর সন্ধিতে প্যাটেলা অবস্থান করে। অস্থিটি প্রায় ত্রিকোণাকার এবং ভিতরের দিকটি ফিমারের সাথে সন্ধি তৈরি করে। এটি হাঁটুকে সুরক্ষিত রাখে।

সিনসাইটিয়াম : হৃৎপিণ্ডের পেশিকোষ কোনো কোনো স্থানে এত নিবিড়ভাবে সহাবস্থান করে যে মনে হয় তারা যেন প্রোটোপ্লাজম দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। এসব স্থানের সংযোগকে সিনসাইটিয়াম বলা হয়।

টেনডন : পেশিগুচ্ছের প্রান্তদুটি শ্বেততন্তু দিয়ে গঠিত ও চ্যাপ্টাকৃতি। এ গুচ্ছটি যখন নলাকার হয় তখন তাকে টেনডন বলে। টেনডন দিয়ে পেশি অস্থির সাথে যুক্ত থাকে।

লিগামেন্ট : সন্ধি সৃষ্টিকারী অস্থিগুলোর সংযোগকারী আর্টিকুলার ক্যাপসুল পুরু বা মোটা করার বস্তু হলো লিগামেন্ট। এটি সন্ধিস্থলের অস্থিগুলোকে যথাস্থানে সুরক্ষিত রাখে।

লিভার : অস্থি ও পেশির আন্তঃক্রিয়ায় এক বিশেষ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হওয়াকে লিভার (lever) বলে।

পেরিঅস্টিয়াম : অস্থি টিস্যু পেরিঅস্টিয়াম নামক পাতলা আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে।

অস্থিভঙ্গ : আকস্মিক কোনো কিছুর আঘাতের কারণে কোনো অস্থি বা হাড় ভেঙে গেলে বা অস্থিতে ফাটল ধরলে তাকে বলা হয় অস্থিভঙ্গ বা হাড়ভাঙা। সংক্ষেপে, যেকোন কারণে হাড় ফেটে যাওয়া বা **ভেঙে যাওয়াই হলো অস্থিভঙ্গ বা ফ্রাকচার।**

স্থানচ্যুতি : একটি অস্থি অপর একটি অস্থির সঙ্গে যে স্থানে মিলিত হয় সে স্থানই হচ্ছে অস্থিদুটির সন্ধিস্থান। এ সন্ধিস্থান থেকে কোনো অস্থি যদি সরে যায় তখন তাকে স্থানচ্যুতি বা সন্ধিচ্যুতি বলা হয়। সাধারণত কাঁধ, কনুই, কব্জি, বৃদ্ধাঙ্গুল, নিম্নচোয়াল, হাঁটু ইত্যাদি অঙ্গে সন্ধিচ্যুতি হতে দেখা যায়।

মচকানো : অস্থি বা হাড়ে ঝাঁকুনি লাগলে বা মুচড়ে গেলে সে স্থানের অস্থিবন্ধনী বা লিগামেন্ট ও এর চারদিকের তন্তুগুলো ছিঁড়ে যায় বলে খুব কষ্টদায়ক অবস্থাকেই মচকানো বলে। অন্যভাবে বলা যায়, আঘাতজনিত বা অন্য কোনো কারণে লিগামেন্ট তার নিজস্ব ক্ষমতার বাইরে প্রসারিত হলে বা ছিঁড়ে গেলে তাকে মচকানো বা স্প্রেইন (sprain) বলে।